ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্তদ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬ সাল।

মূল্য ।৷০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঁচটি প্রকাশ্য বক্তৃতা বঙ্গীয় পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। এই কয়েকটী বক্তৃতা কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটী বক্তৃতা, প্রার্থনাতত্ত্ব ও প্রকৃত শাস্ত্র, মফঃসলে কোন কোন স্থানেও প্রদত্ত হয়। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, প্রথম ভাগ, পাঠ করিয়া ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু পাঠক, যেরূপ উপকার ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, আমরা আশা করি, এই দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিয়াও তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন। ইতি।

কলিকাতা,
১৩ই আশ্বিন, শনিবার,
১৮১১ শক

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন,
প্রকাশক।

সূচিপত্র।

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রার্থনাতত্ত্ব।

প্রার্থনা ঈশ্বরোপাসনার একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। দেশে দেশে, যুগে যুগে, সাধকগণের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে পরমেশ্বরের সিংহাসনতলে প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছে। প্রার্থনাবলে দুর্ব্বল বললাভ করিয়াছে, পাপাসক্ত পবিত্র হইয়াছে, ভীরু অভয় হইয়াছে, শোকার্ত্ত সান্ত্বনা পাইয়াছে। প্রার্থনাবলে দুরতিক্রমণীয় বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া কোটী কোটী নর-নারী মুক্তিপথে অগ্রসর হইয়াছে। তথাচ বর্ত্তমান্ সময়ে, অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে, প্রার্থনার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায়। প্রার্থনা-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, প্রার্থনার বিরুদ্ধে সচরাচর যে সকল যুক্তি শ্রুত হওয়া যায়, তাহার বিচার করা, এবং প্রার্থনা-তত্ত্বে বিশ্বাস করিবার প্রকৃত কারণ কি, প্রার্থনার ভিত্তিমূল কোথায়, নিরূপণ করা আবশ্যক।

পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, তবে প্রার্থনা কেন?

প্রথমতঃ। প্রার্থনা সম্বন্ধে এই একটী আপত্তি সর্ব্বদাই শুনা যায় যে, পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, তবে প্রার্থনা কেন?

তিনি যখন জানেন যে, আমার কি কি অভাব আছে, এবং সেই সকল অভাব পূর্ণ করিবার ক্ষমতাও যখন তাঁহার আছে, তখন আমার প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি ?

কৃষক বলিতে পারে যে, পরমেশ্বর যখন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তখন আমি কৃষিকার্য্য করিব কেন ? তিনি জানেন আমার কি অভাব আছে, এবং সেই সকল পূরণ করিয়া দিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে, তবে কেন আমি হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া থাকি না ? ছাত্র বলিতে পারে যে, পরমেশ্বর জানেন যে, আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং ইচ্ছামাত্রে আমাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারেন, তবে আমি উহার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিব কেন ?

কৃষক ও ছাত্রের কথায় সকলেই বলিবেন যে, পরমেশ্বরের নিয়ম এই, কৃষিকার্য্য করিলে শস্যোৎপত্তি হয়, তাহা না করিয়া আলস্য পরবশ হইয়া বসিয়া থাকিলে কি তিনি আকাশ হইতে শস্য ফেলিয়া দিবেন ? বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য মানসিক পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা না করিলে কি কেহ বিদ্বান্ হইতে পারে ? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতে পারে ?

যথার্থ কথা। যেমন চাষ করিলে শস্যোৎপত্তি হয়, গ্রন্থাধ্যয়ন করিলে বিদ্যালাভ হয়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক অভাবমোচনের জন্য প্রার্থনায় যে, সে অভাব দূর হয় না,—আধ্যাত্মিক মঙ্গল লাভ হয় না,—কে বলিল ?

প্রার্থনায় ফল আছে কিনা, তাহাই কেবল দেখ। যেমন কৃষিকার্য্যদ্বারা শস্য পাই, গ্রন্থাধ্যয়নদ্বারা বিদ্যা লাভ করি,

সেইরূপ যদি প্রার্থনাদ্বারা আধ্যাত্মিক মঙ্গল প্রাপ্ত হই, তবে কেন বলিব না যে, শস্যলাভ সম্বন্ধে কৃষিকার্য্য যেমন, বিদ্যালাভ সম্বন্ধে পুস্তকপাঠ যেমন, আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রার্থনাও সেইরূপ?* সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যেমন বলিয়া দিয়াছেন, চাষ করিয়া শস্য লাভ কর, মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বিদ্যালাভ কর, সেইরূপ কি তিনি বলিয়া দিতে পারেন না, প্রার্থনাদ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন কর? তিনি যে বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাই স্বীকার করিব, ও তদনুসারে কার্য্য করিব। ঘাড়ের দিকে চক্ষু নাই বলিয়া কি বাস্তব চক্ষুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিব? অথবা চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিব?

পরমেশ্বর কি মানুষের কথা শুনিয়া কাজ করেন?

দ্বিতীয়তঃ। পরমেশ্বর কি আমার কথা শুনিয়া কাজ করেন? যে ধর্ম্ম এমন কথা বলে, তাহা উপধর্ম্ম। সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষের পক্ষে ইহা কখনই সম্ভব নহে। ভক্তকে ব্রহ্মা বর দিলেন যে, সে যাহার যাহার মাথায় হাত দিবে, সেই মরিবে। ভক্ত যখন বর পরীক্ষা করিবার জন্য বরদাতার মস্তকে হাত দিতে গেলেন, ব্রহ্মা প্রাণ ভয়ে পলাইতে আরম্ভ করিলেন! ত্রিভুবন ঘুরিয়াও কোথাও রক্ষা পাইবার স্থান পান না! অশ্বথামার নিকট বিল্বপত্র পাইয়া আপনার কর্ত্তব্য ভুলিয়া মহাদেব শিবির-

---

* ভৌতিক ও সাংসারিক বিষয়ে প্রার্থনা যুক্তিসিদ্ধ কি না, এস্থলে তাহার বিচার করিব না। আধ্যাত্মিক অভাব মোচনের জন্য প্রার্থনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য।

দ্বার ছাড়িয়া দিলেন, পঞ্চপাণ্ডবের পুত্রগণের প্রাণ গেল! স্বর্ণময় গোবৎস পূজায় অনুরক্ত দেখিয়া ক্রোধান্ধ যিহোবা ইস্রায়েলগণকে সংহার করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন; মুসা আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহা করিলে মিশরবাসীরা অখ্যাতি করিবে, এবং তিনি (যিহোবা) ইব্রাহিমের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশ আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় ও সমুদ্রের বালির ন্যায় বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত করিয়া দিবেন, তাহা ভঙ্গ করা হইবে। যিহোবা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মুসা তাহা স্মরণ করাইয়া দিলে, তিনি ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক অনুতাপ করিলেন।*

---

* And the Lord said unto Moses, Go, get thee down; for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt, have corrupted *themselves*:

They have turned aside quickly out of the way which I commanded them: they have made them a molten calf, and have worshipped it, and have sacrificed thereunto, and said, these *be* thy gods O Israel, which have brought thee up out of the land of Egypt.

And the Lord said unto Moses, I have seen this people, and, behold, it is a stiff-necked people:

Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them: and I will make of thee a great nation.

And Moses besought the Lord his God, and said, Lord, why doth thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt with great power, and with a mighty hand?

Wherefore should the Egyptians speak, and say, for mischief did he bring them out, to slay them in the mountains,

এই সকল পৌরাণিক উপন্যাস মাত্র, কল্পিত দেবতার পক্ষে উহা সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু যিনি অনন্ত, অসীম, তিনি কি কীটস্থ কীট মানুষের কথায় ভুলিয়া যাইতে পারেন? মানুষের পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য করেন? তাঁহার ইচ্ছার উপরে হস্তক্ষেপ করে কাহার সাধ্য! তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হয়, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলাই আমাদের কার্য্য। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, তবে প্রার্থনা কেন? আমরা বলি কেমন করিয়া জানিলে প্রার্থনা তাঁহার ইচ্ছানুগত নহে?

প্রার্থনা ব্যতীত কি উন্নতি হয় না?

প্রার্থনাহীন কি উন্নতি করিতে পারেন না? প্রতিজ্ঞাবলে কি উন্নতি হয় না? প্রতিজ্ঞার বল কে না স্বীকার করিবে? সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রবল ইচ্ছা-শক্তিদ্বারা যে ধর্ম্মজীবনের অনেক বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা যায়, ইহা পরি-ক্ষিত সত্য। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবলে উন্নতি হয়, স্বীকার করিলে কি প্রার্থনার আবশ্যকতা উড়িয়া যায়? কোন বিশেষ কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে একটি উপায় স্বীকার করিলে কি আর একটির আবশ্যকতা অস্বীকার করা হয়? ঠেলা গাড়ী আছে

---

and to consume them from the face of the earth? Turn from thy fierce wrath, and repent of this evil against thy people.

Remember Abraham, Isaac and Israel, thy servants to whom thou swearest by thine own self, and saidst unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it for ever.

And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people.—*Exodus. Chapter* XXXII.

বলিয়া, কি গরুর গাড়ীতে যাওয়া যায় না? গরুর গাড়ী আছে বলিয়া, কি ঘোড়ার গাড়ীর প্রয়োজন নাই? ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া যায় বলিয়া, কি রেল গাড়ীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে? কিন্তু এস্থলে ইহাও বলি যে, প্রতিজ্ঞাবলে ধর্ম্ম-জীবনের প্রতিবন্ধক নিচয় কতক পরিমাণে বিদূরিত হয় বলিয়া যে, তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে, ইহা কথনই সম্ভব নহে। জীবনের পরীক্ষায় সাধক বুঝিতে পারেন যে, হৃদ্গত গভীর প্রার্থনাব্যতীত, কেবল প্রতিজ্ঞাবলে প্রকৃত মঙ্গল লাভ করা যায় না। জীবনের পরীক্ষায় যাহা বুঝা যায়, শুদ্ধ তর্কে তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? কিন্তু প্রতিজ্ঞার বল স্বীকার করিলেও যে, প্রার্থনার আবশ্যকতা উড়িয়া যায় না, ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

প্রার্থনা ও নিয়ম।

সন্দেহবাদীরা বলেন যে, যথন ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিভাগই অখণ্ডনীয় নিয়মে চলিতেছে, তথন প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? যে বিষয়ের যে নিয়ম তাহাই প্রতিপালন করিতে হইবে। নিয়মানুসারে চলি-লেই ফললাভ হয়। প্রার্থনার প্রয়োজন কি?

এই আপত্তিটির মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক, নিয়ম কাহাকে বলে। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। সূর্য্যকিরণ সমুদ্রজলে পতিত হইল; বায়ু অপেক্ষা বাষ্প লঘু, সুতরাং বাষ্প ঊর্দ্ধগামী হইয়া আকাশে উঠিয়া মেঘ হইল। শীতল বায়ুর সহিত মেঘরূপী বাষ্পের সংস্পর্শ হওয়াতে

উহা পুনর্ব্বার জল হইয়া মাধ্যাকর্ষণগুণে ভূমিতলে পতিত হইল। লোকে বলিল বৃষ্টি হইতেছে। যখনই জলের সহিত উত্তাপের যোগ হয়, তখনই জল বাষ্প হয়; যখনই জল বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখনই উহা ঊর্দ্ধগামী হয়; যখনই ঊর্দ্ধগত মেঘরূপী বাষ্পে শীতল বায়ু সংলগ্ন হয়, তখনই উহা আবার জলের আকার ধারণ করে; এবং যখনই উহা জলরূপে পরিণত হয়, তখনই মাধ্যাকর্ষণ গুণে ভূমিতলে পতিত হয়। ভগবানের জলের কল এইরূপে চলিতেছে। নিয়মানুসারে নিরন্তর এই প্রকার ঘটিতেছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত। শুষ্কতৃণ অগ্নিতে দিলে দগ্ধ হয়। যখনই শুষ্কতৃণ অগ্নিতে দেও, তখনই উহা দগ্ধ হয়। ইহা নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে।

বহির্জ্জগতে যেমন, মনোজগতেও সেইরূপ। ভাবসঙ্গ (Association of ideas) একটি মানসিক নিয়ম। বিপরীত পদার্থ পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্ফীতোদর স্থূলদেহ লোক দেখিলে, কৃষব্যক্তিকে স্মরণ হয়; বড় দুঃখের সময়, সুখের অবস্থা স্মরণ হয়। সদৃশ পদার্থ পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। একটি স্থূলদেহ দেখিলে আর একটি স্থূলদেহ স্মরণ হয়; একটি দুঃখ, আর একটি দুঃখকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কারণ ও কার্য্য পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দগ্ধ পদার্থ ও অগ্নি পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সংযুক্ত পদার্থের একটি মনে হইলে আর একটি মনে হইতে পারে। একটি বাড়ী মনে হইলে তাহার পার্শ্বের বাড়ী মনে হয়। যে কোন প্রকারে হউক, পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলে একটি আর একটিকে স্মরণ করাইয়া

দেয়। কোন পরিবারের একটি লোক দেখিলে, সেই পরি-বারের অন্য লোককে মনে হইতে পারে। এই ভাবসঙ্গ একটি নিয়ম।

অনেক স্থলে একটি নিয়মদ্বারা আর একটি নিয়ম অতিক্রান্ত বা প্রতিরুদ্ধ হয়। পৃথিবী তোমাকে আপনার দিকে টানিতেছে, অথচ তুমি উর্দ্ধে লম্ফ দিয়া উঠিতে পার। শুষ্ক তৃণ অগ্নিতে দগ্ধ হয়; কিন্তু আর্দ্রতৃণ দগ্ধ হয় না। একখানা রুমাল অগ্নিতে ফেলিয়া দিলে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সুরাসারে ভিজাইয়া দিলে যেমন রুমাল তেমনি থাকে। অনেক বাজিওয়ালা এইরূপে দর্শকগণকে আশ্চর্য্য করিয়া থাকে। বাজিওয়ালাদিগের অদ্ভুত ক্রিয়া সকল প্রাকৃতিক নিয়মের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুঝিনা বলিয়াই আশ্চর্য্য হই।

তবে নিয়ম কি? বৈজ্ঞানিকেরা কাহাকে নিয়ম বলেন? আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির কার্য্য কখন বিশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হয় না। আজ এক প্রকারে, কল্য অন্য প্রকারে; এখন এক প্রকারে, তখন অন্য প্রকারে হয় না! অদ্য সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদয় হইল, কল্য পশ্চিমে উঠিতে পারে; অদ্য শীতল জল তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে, কল্য তপ্তাঙ্গার তৃষ্ণা দূর করিতে পারে; চূর্ণ ও হরিদ্রায় এখন লোহিতবর্ণ হইতেছে, তখন হয় তো কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে; সংসার এরূপ বিশৃঙ্খল স্থান নহে। সমান কারণের সমান কার্য্য, সকল সময়ে হইবেই হইবে। এই যে অপরিবর্ত্তনীয় সমান ভাবে প্রকৃতির কার্য্য চলিতে দেখা যাইতেছে, (uniformity observed in the course of nature,) ইহার নাম নিয়ম।

প্রকৃতির কার্য্য ও পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

প্রকৃতির কার্য্য প্রণালীর নামই যদি নিয়ম হইল, তবে জিজ্ঞাসা করি, এই কার্য্যপ্রণালী বাস্তবিক কাহার? যে প্রকারে প্রকৃতির কার্য্য চলিতেছে,—প্রাকৃতিক ব্যাপারের যে প্রণালা, —উহা কাহার কার্য্যপ্রণালী? আস্তিক মাত্রেই বলিবেন, উহা পরমেশ্বরের কার্য্যপ্রণালী,—প্রকৃতির কার্য্য মাত্রই পুরুষের কার্য্য। প্রকৃতির স্বাধীন সত্তা নাই, পুরুষের সত্তাতেই প্রকৃতির সত্ত', পুরুষের কর্ত্তৃত্বেই প্রকৃতির কার্য্য।

তবে যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহাই পরমেশ্বরের নিয়ম। তাঁহার ইচ্ছাশক্তিতে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, ব্রহ্মাণ্ড সেই প্রকারে বা সেই নিয়মে চলিতেছে। তবে জগতের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছা ও তাঁহার নিয়ম স্বতন্ত্র নহে; তাঁহার ইচ্ছা ও তাঁহার নিয়ম একই। প্রাকৃতিক নিয়ম ও ভগবানের ইচ্ছার মধ্যে ভিন্নতা কোথায়?

যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলেন যে, প্রার্থনা নিয়মবিরুদ্ধ, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, প্রার্থনা কোন্ নিয়মের বিরুদ্ধ? শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক, যত প্রকার নিয়ম আছে, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে তন্মধ্যে কোন্ নিয়মটি অতিক্রম করা হয়? এপর্য্যন্ত কোন প্রার্থনাবিরোধী তাহা প্রতিপন্ন করেন নাই।

পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করাই যদি আমাদের কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে প্রার্থনা বিরোধীকে জিজ্ঞাসা করি, কেমন করিয়া জানিলে যে প্রার্থনাই তাঁহার একটি আধ্যাত্মিক নিয়ম নহে? জল উত্তপ্ত হইলে বাষ্প হয়; বাষ্প শীতল হইলে জল

হয়; ক্ষুধার সময় অন্ন গ্রহণ করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া শীতল জল পান করিলে তৃষ্ণা দূর হয়, সেইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রেম ও পবিত্রতা লাভ হয়। কেন বলিব না, যে এই সকল গুলিই পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়? জল বাষ্প হওয়াতে যেমন নিয়ম, প্রার্থনাদ্বারা আধ্যাত্মিক মঙ্গললাভেও সেইরূপ নিয়ম। একটি স্থলে নিয়ম স্বীকার করিবে, আর একটি স্থলে করিবে না কেন?

প্রার্থনা, অনুগ্রহ ও নিয়ম।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বর যখন বিনা প্রার্থনায় সহস্র সহস্র বিষয় আমাদিগকে দান করিতেছেন,—তিনি যখন করুণাময়,—তখন আবার প্রার্থনা কেন?

যথার্থ কথা। তিনি আমাদিগের প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়াই আমাদিগকে প্রতিনিয়ত অনুগ্রহ বিতরণ করিতেছেন। সেই জন্যই সাধক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে বলেন, "না চাহিতে দিয়াছ সকল।" কিন্তু এই যে প্রার্থনা করিবার শক্তি ও অধিকার, ইহা কি তাঁহার একটি নিরুপম অনুগ্রহ নহে?

একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। আমি নিয়ম করিলাম যে, আমার পুত্র অযাচিতরূপে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় প্রাপ্ত হইবে, কেবল কোন কোন বিশেষ বিষয়, (মনে করুন; তাহার পড়িবার পুস্তক, লিখিবার কাগজ ইত্যাদি) আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইতে হইবে। যদি আমি এরূপ নিয়ম করি, অন্যায় করা হয় কি না? স্থূলদর্শী লোকে মনে করিতে পারে যে, উহা

অন্যায়। কিন্তু উহার মধ্যে বাস্তবিক কি আমার কোন গূঢ় শুভাভিপ্রায় থাকিতে পারে না?

নিশ্চয়ই পারে। পিতার অযাচিত কৃপালাভ করিলেই যে, পিতা পুত্রে সদ্ভাবসঞ্চার হয়, সংসারে সর্ব্বদা এরূপ দৃষ্ট হয় না। অনেক পরিবারে দৃষ্ট হয় যে, পিতা পুত্রে যেন আলাপ নাই, অনেক স্থলে পিতার অযাচিত অনুগ্রহে ডুবিয়া থাকিয়াও, পুত্র তাহা অনুভব করিতে পারে না। পিতার লক্ষ টাকার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াও কৃতজ্ঞ হইতে পারেনা। কিন্তু যে পুত্র পিতার নিকট গিয়া আপনার অভাব জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার অনুগ্রহে তাহা পূরণ করিয়া লইতে পারে, সে অধিকতর কৃতজ্ঞ হয়, অথবা হইবার সম্ভাবনা। অন্ততঃ পিতার সঙ্গে তাহার আলাপ হয়; পিতার সহিত সম্বন্ধ সে অধিকতর রূপে অনুভব করে।

বিশ্বপিতার অযাচিত কৃপায় আমরা ডুবিয়া রহিয়াছি। কিন্তু কয় জন লোক তাহা অনুভব করে? যখন বিপদে পড়ি, চারিদিক্ অন্ধকার দেখি, অনন্যগতি হইয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন করি, যখন তাঁহার করুণাহস্তে বিপদজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তখন কাহার না হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়? কে চক্ষের জল নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে?

আমি যদি নিয়ম করি যে, আমার পুত্র কোন কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইবে, তাহাতে কি আমার কোন গূঢ় অভিপ্রায় থাকিতে পারে না? ঐ প্রকার চাহিয়া লওয়াতে আমার সহিত তাহার সম্বন্ধ সে অধিকতর অনুভব করিবে, পিতাপুত্রে আলাপ হইবে, এই গূঢ় শুভাভিপ্রায়

কি উহাতে থাকিতে পারেনা? জগৎপিতাও কি এই অভি-প্রায়ে প্রার্থনার নিয়ম করিতে পারেন না, যে, তাহা হইলে তাঁহার মানব সন্তানগণ তাঁহার নিকট আসিবে, তাঁহার সঙ্গে তাহাদের আলাপ পরিচয় হইবে? আত্মপ্রভাব অনেক সময় মানুষকে অহঙ্কারী করে, কিন্তু ভগবানের দ্বারের ভিখারী হইলে, তাহার হৃদয়ে স্বর্গীয় বিনয় ও কৃতজ্ঞতা আসিয়া অবতীর্ণ হয়।

এস্থলে একটি কথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, প্রার্থনা পরমেশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়মের বিরোধী নহে। আমি যদি নিয়ম করি যে, আমার পুত্র কোন কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ আমার নিকট চাহিয়া লইবে, এবং আমার পুত্র যদি তদনুসারে তাহা চাহিয়া লয়, তাহাতে কি আমার নিয়ম বা ইচ্ছার প্রতিরোধ করা হয়, না, আমার নিয়ম বা ইচ্ছার অনুগত হইয়া কার্য্য করা হয়? স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উহাতে আমার পুত্র আমার নিয়মানুসারে কার্য্য করে, আমার ইচ্ছানুগত হইয়াই চলে। উহাতে পিতা ও সন্তানের ইচ্ছার সম্মিলন হয়। পরমেশ্বরের ও মানুষের ইচ্ছা বিপরীত পথে চলে। তিনি বলিতেছেন, পশুপ্রকৃতির উপরে উঠিয়া দেবত্ব লাভ কর; মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া অনেকস্থলে পশুর অধম হইতেছে। তিনি বলিতেছেন, আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া জীবের হিতসাধনে প্রাণ মন সমর্পণ কর; মানুষ আপনার ক্ষুদ্র সুখ, আপনার ক্ষুদ্রদুঃখে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মসন্তানের সেবারূপ পরম ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। এই ইচ্ছার অসম্মিলনই অধর্ম্ম। এই ইচ্ছার অসম্মিলন পিতাপুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করে। প্রার্থনা, ইচ্ছার সম্মিলন সাধন করে; প্রার্থনা, পুত্রকে পিতার নিকট লইয়া যায়।

সেইরূপ যদি পরমেশ্বর নিয়ম করিয়া থাকেন যে, তাঁহার সন্তান তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক মঙ্গল ভিক্ষা করিয়া লইবে, তাহা হইলে, যখন মানুষ আপনার দুর্গতি দূর করিবার জন্য, প্রেম পুণ্য লাভ করিবার জন্য, তাঁহার শরণাপন্ন হয়,—তাঁহার নিকট প্রার্থী হয়,—তখন তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, মানুষ তাঁহারই নিয়মানুগত হইয়া কার্য্য করে। পিতা পুত্রের সম্মিলন সাধিত হয়।

আমার পুত্র যখন আমার নিকট আসিয়া তাহার জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনোপযোগী পুস্তক প্রভৃতি চাহিয়া লয়, তখন তাহার ইচ্ছা ও আমার ইচ্ছার মিলন হয়। সেইরূপ মানুষ যখন জগতের পিতার নিকট প্রেম ও পুণ্য প্রার্থনা করে, তখনও মানুষের ইচ্ছা ও তাঁহার ইচ্ছার মিলন হয়। কি পার্থিব পিতা, কি স্বর্গীয় পিতা, উভয় স্থলেই পিতা পুত্রের ইচ্ছার মিলন।

ক্ষুধার্ত্ত শিশু যখন মাতার নিকট দুগ্ধ প্রার্থনা করে, তখন শিশুর ইচ্ছা ও মাতার ইচ্ছার মিলন হয়। জগতের মাতার ইচ্ছার সহিত তাঁহার সন্তানগণের ইচ্ছার বিরোধ যত নষ্ট হয়, তাঁহার ইচ্ছা ও আমাদের ইচ্ছা যত একীভূত হয়, ততই আমাদের মঙ্গল, ততই আমরা মুক্তিপথে অগ্রসর। যে ভগবদ্ভক্ত সাধু আপনার অন্তরে সুস্পষ্ট অনুভব করেন যে, তাঁহার ইচ্ছা ও পরমেশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে বিরোধ নাই, নদী সমুদ্রের ন্যায় উভয় ইচ্ছা সম্মিলিত হইয়াছে, তিনিই বলিতে পারেন, "আমি এবং আমার পিতা এক" "I and my Father are one."

আত্ম-নির্ভর ও প্রার্থনা।

প্রার্থনা সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, প্রার্থনা মানবহৃদয়ের

নীচ ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। যাঁহার আত্মসম্মান বোধ আছে, তিনি সকল অবস্থায় আপনার শক্তি সামর্থ্যের প্রতি নির্ভর করেন। অন্যের দ্বারস্থ হওয়া হীনতা। আত্মনির্ভরেই মানবপ্রকৃতির প্রকৃত মহত্ত্ব। দুঃখে বিপদে, পাপপ্রলোভনে, সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় যিনি পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আপনার আন্তরিক শক্তির উপর নির্ভর করেন, তিনিই মানুষ। আপনার পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ানই মানুষের স্বভাব। আত্মনির্ভরেই প্রকৃত মহত্ত্ব;—প্রার্থনা দুর্ব্বলতা-প্রসূত হীনভাব।

এই সকল কথার মধ্যে সত্য আছে; কিন্তু তাহা অনিষ্টকর অসত্যের সহিত জড়িত। আত্মনির্ভর ভাল। কিন্তু মনুষ্য যখন দুর্ব্বল পরিমিত জীব;—মনুষ্যশক্তির যখন সীমা আছে, তখন আত্মনির্ভরের ন্যায় অপরের সাহায্য প্রত্যাশা করাও মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক;—কেবল স্বাভাবিক নয়, অবশ্যম্ভাবী। মানুষের সাহায্য ব্যতীত মানুষ ইহসংসারে থাকিতে পারে না; —থাকা অসম্ভব। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ মানবজীবন পরস্পর সাহায্যসাপেক্ষ। কে বলিতে পারে যে, আমি একাকী অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কৃষিকার্য্য, বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্ম্মাণ, বিজ্ঞানশিক্ষা প্রভৃতি সকলই করিব?—সুবিধা, সুখ ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইব? অন্যের সাহায্য ব্যতীত মানবজীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব। শৈশবে, বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, মানুষ, মানুষের ক্রোড়ে বসিয়া, মানুষের হস্ত ধরিয়া, মানুষের মুখ পানে তাকাইয়া, মানুষের স্কন্ধে ভর দিয়া জীবন পথে অগ্রসর হয়। নতুবা জীবন সুখকর হওয়া দূরে থাকুক, জীবনের অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। আত্মনির্ভর ভাল; যতদূর মানুষ

আপনার ব্যক্তিগত শক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া চলিতে পারে, ততদূর স্বাভাবিক, সঙ্গত ও উচিত। কিন্তু সেই সীমা অতিক্রান্ত হইলেই মানুষ পদে পদে মানুষের মুখাপেক্ষী;—তখন আর মানুষ অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারে না;—"আমি আপনি সব করিব, অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইব না।"

যখন মানুষের সাহায্য ভিন্ন মানুষ অর্দ্ধ ঘণ্টা চলিতে পারে না, তখন, কে তুমি হে মানুষ! যে তুমি বলিতে পার যে, সেই অগম্য অপার বিশ্বকারণ, বিশ্ববিধাতা, বিশ্বজীবন, জগতের পিতা মাতা পরমেশ্বরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে তোমার অপমান হয়! তোমার পক্ষে হীনতা হয়! হে কীটস্থ কীট! যে অনন্তদেব প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার প্রাণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যাঁহার সত্তায় তোমার সত্তা, তাঁহার নিকট তোমার আত্মগৌরব কি! যদি কিছু গৌরব থাকে, তাহা সেই অনন্ত সাগরেরই এক কণিকা মাত্র।

প্রার্থনাবিরোধীদিগের উক্ত আপত্তি যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত হইলে কেবল প্রার্থনার মত খণ্ডিত হয়, এরূপ নহে, উহাতে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন যে, ভগবানের প্রতি নির্ভর ধর্ম্মের মূল ভাব। মানুষ যত দিন আত্মসম্মান বা আত্মগৌরবের সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে, ততদিন সে ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ। পরিমিত যখন অনন্তের প্রতি নির্ভর করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই তাহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রতি নির্ভরেই ধর্ম্মের আরম্ভ, নির্ভর-ভাবের উন্নতিতেই ধর্ম্মের উন্নতি। বাবা নানক বলিয়াছেন:—"কুকুর যেমন তাহার প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, সেইরূপ, হে ঠাকুর! আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিব।"

আলস্য ও প্রার্থনা।

কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলেন যে, প্রার্থনা করা কুঁড়ের কর্ম্ম। ছোট শিশু মার কাছে দুগ্ধ প্রার্থনা করে; কিন্তু যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি,—কোন "বুড়ো খোকা"—মাকে বলে "মা দুদ খাওয়াইয়া দেও" তাহা কি নিতান্ত হাস্যকর হয় না?

প্রার্থনা করা কুঁড়ের কর্ম্ম নয়। পরিশ্রমী ভিন্ন প্রার্থনা করিতে পারে না। যিনি ধর্ম্মসাধনব্রতে ব্রতী হইয়া সংসারের কোন কষ্টকেই কষ্ট বোধ করেন না, কোন প্রকার পরিশ্রমকেই পরিশ্রম বলিয়া মনে করেন না;—যিনি জীবনের উদ্দেশ্য সাধন-কার্য্যে আপনার হৃদয়ের শোণিত বিন্দু বিন্দু করিয়া অর্পণ করিতে প্রস্তুত, তিনিই প্রার্থনা করিবার উপযুক্ত।

ভয়ঙ্কর পদ্মার মধ্যে নাবিক যখন প্রবল ঝটীকায় পতিত হয়, চারিদিকে উত্তাল তরঙ্গ, যখন আর সে নৌকা বাঁচাইতে পারে না,—আর তাহার "হালে পানি পায় না," তখনই তাহার মুখ হইতে "আল্লা আল্লা" ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে; তখনই সে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করে, আরোহীগণকে আপনার আপনার দেবতার নাম লইতে অনুরোধ করে। যখন সন্তরণকারীর হস্তপদ অবশ হইয়া যায়, তখনই সে "রক্ষাকর রক্ষাকর" বলিয়া চীৎকার করে।

পার্থিব বিষয় অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিষয়ে উহা আরও অনেক গুণে অধিক। মানুষ যখন অন্তর বাহিরে রিপুর অত্যাচারে জর্জ্জরিত ও ক্ষতবিক্ষত;—যখন তাহার সহস্র প্রতিজ্ঞা চূর্ণ বিচূর্ণ,—যখন সংসাররূপ ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতি পদবিক্ষেপে প্রলোভন, বিপদ ও মৃত্যু তাহার সম্মুখীন, যখন বিদ্যা বুদ্ধি,

শক্তি সামার্থ্য সত্ত্বেও মানুষ পর্যুস্ত ও বিভ্রান্ত, তখন কোথায় থাকে আত্মনির্ভর, কোথায় থাকে আত্মগৌরব; তখন মানুষের প্রাণ আপনা হইতে সংসারাতীত জ্ঞানশক্তিকরুণার নিকট "রক্ষাকর রক্ষাকর," বলিয়া চীৎকার করে।

শিশুকে মাতা দুগ্ধ পান করাইয়া দেন, যুবা ও বৃদ্ধ আপনি দুগ্ধ পান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে সকলেই শিশু। এখানে সকলকেই মাতার হস্তে দুগ্ধ পান করিতে হয়। আমি বিজ্ঞ, আমি প্রবীন, এরূপ অভিমান থাকিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। শিশু না হইলে সে রাজ্যে প্রবেশের অধিকার হয় না।

প্রার্থনার স্বরূপ।

প্রার্থনা কি? প্রার্থনা ভাষা নহে, প্রার্থনা অঙ্গ ভঙ্গী নহে, প্রার্থনা চক্ষের জল নহে। রোবা ছেলে যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া মার মুখ পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টি করে, তখন কি সে প্রার্থনা করে না? প্রার্থনা ভাষা নহে। পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগত রোগীর প্রাণ যখন শান্তির জন্য লালায়িত হয়, তখন কি সে প্রার্থনা করে না? প্রার্থনা করযোড় প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গী নহে। যখন শোকদগ্ধ হৃদয় আপনার আগুণে আপনি জ্বলিতে থাকে, শোকান্তকারী পরম পুরুষের নিকট "ত্রাহি ত্রাহি" করিতে থাকে, অন্তরস্থ যন্ত্রণার এক কণিকাও অশ্রুবারিরূপে বাহিরে প্রকাশ পায় না, তখন কি সে হৃদয় প্রার্থনা করে না? প্রার্থনা চক্ষের জল নহে। রোগী যখন রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অধীর কাতরপ্রাণে চিকিৎসককে বলে,—"রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করুন;" সন্তরণ-নিরত অবসাঙ্গ ব্যক্তি যখন

ভীতিবিহ্বল হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুলভাবে অন্যের সাহায্য প্রতীক্ষা করে, তখন তাহারা প্রার্থনা করে। কিন্তু তাহাদের প্রার্থনা বাহিরে নহে, অন্তরে। বাহিরে তাহার প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু সকল অবস্থাতেই প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে আন্তরিক পদার্থ ;—প্রার্থনা মানসিক অবস্থা বিশেষ।

সেই অবস্থাটী কি ? প্রার্থনার স্বরূপ কি ? প্রার্থনা বলিলে কি বুঝায় ? কি কি উপাদানে উহা গঠিত। চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত হইয়া চুনে হলুদ। হাইড্রজিন ও অক্সিজিন মিশ্রিত হইয়া জল। নাইট্রজিন ও অক্সিজিনে বাতাস। সেইরূপ কি কি মানসিক অবস্থার সংমিশ্রণে প্রার্থনারূপ অবস্থার অভ্যুদয় ?

একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। শীতল জলপূর্ণ পাত্র হস্তে সম্মুখে কেহ দণ্ডায়মান হইলে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা কিরূপ হয় ? তন্মধ্যে এই তিনটী বিষয় দেখিতে পাই। প্রথম, সে ব্যক্তি শীতল জলের অভাব অনুভব করিতেছে, দ্বিতীয়, সেই অভাব দূর করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে ; তৃতীয়, সেই জলপাত্র ও পাত্রধারী ব্যক্তির প্রতি তাহার চিত্ত নির্ভর ও প্রত্যাশাপূর্ণ হইয়া ধাবিত হইতেছে।

সেইরূপ প্রার্থনার মধ্যেও তিনটী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অভাববোধ, অভাব দূর করিবার জন্য ব্যাকুলতা, এবং তজ্জন্য ভগবানের নিকট হৃদয়ের একান্ত নির্ভর।

প্রার্থনার ভিতরে এই যে তিনটী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, উহার কোনটী ছাড়িয়া দিলে চলে কি ? অর্থাৎ উহার মধ্যে একটী কিম্বা দুটী ভাব পরিত্যাগ করিলে প্রার্থনার স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে কি ?

প্রথমতঃ দেখ অভাববোধ ব্যতীত প্রার্থনা সম্ভব কি না। কখনই না। যে জানেনা, অনুভব করেনা, যে তাহার অভাব আছে, তাহার প্রার্থনা কেমন করিয়া হইবে? কিসের জন্য হইবে? দ্বিতীয়তঃ, যে ব্যক্তি অভাব দূরীকরণের জন্য ব্যাকুল নহে, তাহার পক্ষেই বা প্রার্থনা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? তৃতীয়তঃ, অভাব দুর হইবার জন্য পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর ব্যতীতই বা কেমন করিয়া প্রার্থনা হইতে পারে? এই তিনটী কথা এত সহজ যে, উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

এস্থলে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, নির্ভর হইলেই কি প্রার্থনা হইল? নির্ভর ও প্রার্থনা কি একই পদার্থ? নির্ভরের ভাব ও প্রার্থনার ভাব নিশ্চয়ই এক। আমি কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতেছি, ইহার অর্থ কি? ইহাই কি নহে যে, কোন কার্য্য করিতে আমি আপনাকে অক্ষম বলিয়া অনুভব করিতেছি এবং ইচ্ছা করিতেছি যে, কোন ব্যক্তি আমাকে সে বিষয়ে সাহায্য দান করেন?—অর্থাৎ আমার মন চাহিতেছে যে, আমি সাহায্য পাই। "নির্ভর করিতেছি" ইহার অর্থ এই যে, আমি মনে মনে বলিতেছি, 'আমি পারি না, তিনি আমাকে সাহায্য করুন, বা তুমি আমাকে সাহায্য কর।' "তোমার প্রতি নির্ভর করি," অর্থাৎ তোমার সাহায্য চাই বা প্রার্থনা করি। ভাষায় বাহিরে যেরূপেই কেন ভাব প্রকাশ হউক না, অন্তরের অন্তরে নির্ভর ও প্রার্থনা একই পদার্থ।

পুর্ব্বোক্ত তিনটী ভাব লইয়া প্রার্থনা,—উহার কোন একটী ছাড়িয়া দিলে প্রার্থনার স্বরূপ বিনষ্ট হয়,—ইহা সত্য হইলেও প্রাথনার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিষয়ক বিচারে উহা

আসল কথা নহে। ঐ তিনটী ভাব লইয়াই প্রার্থনা, ইহা বুঝিলেই যে, প্রার্থনা সম্বন্ধীয় বিচারের মীমাংসা হইল, এরূপ নহে। ঐ তিনটীর মধ্যে শেষ কথাটীতেই বিশেষ আপত্তি। অভাববোধ ও অভাব দূরীকরণের জন্ত ব্যাকুলতা, এই দুটী যে উন্নতির জন্ত একান্ত আবশ্যক, তাহা কে না বলিবে? নিরীশ্বরবাদীও তাহা স্বীকার করেন। এস্থলে প্রার্থনাবিরোধী বলিবেন যে, ঐ দুটী হইলেই হইল; পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর আবার কেন?

যদি শেষটী ছাড়িয়া দিয়াও ফল সমান হইত, তাহা হইলে আপত্তিটী যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হয় না। কেবল মাত্র অভাববোধ ও ব্যাকুলতায় একপ্রকার ফল আছে, সত্য বটে, কিন্তু ঐ তিনটী ভাবের রাসায়নিক সংযোগে যে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ফল লাভ হয়, তাহার সহিত আর কিছুরই তুলনা হয় না।

পিতলের একখানি থালার উপরে চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিলাম। উহা লোহিত বর্ণ হইল। কেবল চূর্ণ ও হরিদ্রার পরস্পর সংযোগে লোহিত বর্ণ হইল, অথবা চূর্ণ হরিদ্রা ও পিতলের সংযোগে হইল, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্ত পিতল নির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্ত প্রকার ধাতুপাত্রে, বা প্রস্তরপাত্রে বা কেবল হস্তের উপর চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া দেখিলাম, সেইরূপই লোহিত বর্ণ হইল। সুতরাং বুঝিলাম যে, পিতলপাত্র লোহিত বর্ণের উৎপত্তির হেতু নহে।

বিচার্য্য বিষয় সেইরূপ করিয়া পরীক্ষা করা কি সম্ভব? একপ্রকার সম্ভব। কেবল সম্ভব কেন? কার্য্যতঃও অনেক সময় তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। কেবলমাত্র অভাববোধ ও ব্যাকুল-

তার ফল কি, তাহা জানি, সেই সঙ্গে যখন ভগবানের প্রতি একান্ত নির্ভর আসিয়া মিলিত হয়, তাহারও ফল কি, জানি। এই উভয়ই পরীক্ষাসিদ্ধ জ্ঞান,—প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া দিতেছে যে, উভয়ের ফলে আকাশ পাতাল প্রভেদ। অতিরিক্ত ব্যাকুলতা মানুষকে পাগল করে। তৃষ্ণায় কি তৃষ্ণা নিবারণ হয়? জল চাই। যখন হৃদয় তাঁহার দিকে ছুটিয়া যায়, তখনই এমন কিছু পায়, যাহাতে তাহার যন্ত্রণা দূর হয়। যখন তৃষিত চাতক "ফটিক জল" বলিয়া ডাকিতে থাকে, তখনই স্বর্গ হইতে অমৃত ধারা তাহার শুষ্ককণ্ঠ সরস করে। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ,—প্রত্যক্ষ সকল প্রমাণের মূল।

প্রার্থনা কি? অন্ধকারে বাক্‌স খুলিতে গিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে যখনই ঠিক্ জায়গায় চাবিটী লাগে ও ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, তখনই বাক্স খুলিয়া যায়। প্রার্থনা সেই চাবি ঘুরান। যখনই চাবি ঘুরিবে, অমনি বাক্স খুলিবে।

ঐ সামগ্রীটি অন্ধকারে রহিয়াছে। ওখান হইতে সরাইয়া এখানে রাখ, সূর্য্য কিরণ আপনি উহার উপরে পড়িবে। সেই রূপ মোহমগ্ন মনকে সরাইয়া অধ্যাত্মরাজ্যের এমনি স্থানে রাখিতে হইবে যে, আপনিই উহার উপর আলোক পড়ে। প্রার্থনা সেই স্থান।

আত্মার উপরে পরমেশ্বরের কার্য্য, না, আত্মার নিজের উপরে নিজের কার্য্য?

প্রার্থনার বিরুদ্ধে আর একটী আপত্তির মীমাংসা করিয়া আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার করিব। অনেকেই বলেন যে,

প্রার্থনা করিলে যে, আধ্যাত্মিক উপকার লাভ হয়, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু কে বলিল যে, স্বয়ং পরমেশ্বর কৃপা করিয়া প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ মনুষ্যের আত্মায় আধ্যাত্মিক মঙ্গল প্রেরণ করেন? প্রার্থনা করিবার সময় কতক্ গুলি মানসিক বৃত্তির পরিচালনা হয়। যে ভাব, ভক্তি বা বল, প্রার্থনাদ্বারা লাভ হয় বলিয়া মনে করিতেছ, তোমার প্রার্থনা শ্রবণে পরমেশ্বর তোমাকে যাহা দান করেন বলিয়া বিশ্বাস কর, বাস্তবিক তাহা পরমেশ্বরের দান নহে, তোমার মনোবৃত্তি সঞ্চালনের ফল মাত্র। প্রার্থনাশীল প্রার্থনা করিয়া ফললাভ করেন বটে, কিন্তু তাহা মানবাত্মায় পরমেশ্বরের কার্য্য নহে; আত্মার নিজের উপরে নিজের কার্য্য। এই আপত্তিটির পরিস্কার মীমাংসা করিতে হইলে, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বিষয়ে একটী তত্ত্বের আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

কার্য্যকারণসম্বন্ধ মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব সাপেক্ষ নহে। যে কারণ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হইবে, তাহা হইবেই। কি বহির্জগতে কি অন্তর্জগতে, আমাদের ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বত্রই কার্য্যকারণশৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া চলে, কখনই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। আমার অঙ্গুলি অগ্নি সংশ্রবে আসিল; অঙ্গুলি অবশ্য দগ্ধ হইবে। আমি অগ্নিতে অঙ্গুলি দিতে পারি, অথবা অগ্নি হইতে দূরে রাখিতে পারি, এই টুকু আমার স্বাধীনতা, কিন্তু যদি আমার অঙ্গুলি অগ্নির সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে উহা দগ্ধ হইবে। অগ্নিতে হস্ত দিয়া যদি আমি বলি, হস্ত দগ্ধ হইয়া কাজ নাই; অগ্নি সে কথা শুনিবে না। আমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি, শীতল জল পান করা বা না করা আমার কার্য্য। জল পান করিতে পারি, না করিতেও পারি, কিন্তু যদি শীতল জল কণ্ঠে ঢালিয়া দি, তাহা

হইলে নিশ্চয়ই তৃষ্ণা নিবারণ হইবে। জলপান করিতে করিতে যদি বলি তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া কাজ নাই, আমার কথায় কিছুই হইবে না, তৃষ্ণা নিবারিত হইবে। অমৃতের কার্য্য অমৃত করে, বিষের কার্য্য বিষ করে। যাহার যে কার্য্য তাহা হইবে। বিষ পান করিয়া যদি ইচ্ছা করি, শরীর সুস্থ থাকুক, কেন থাকিবে? উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া যদি বলি, ক্ষুধা থাকুক, কেন থাকিবে? জড়জগৎ সম্বন্ধে যেমন, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও সেই রূপ। মনুষ্যের মনে ভাবসঙ্গের নিয়ম (Association of ideas) কার্য্য করিতেছে। উহা আমাদের কর্তৃত্বাধীন নহে। জ্ঞানালোচনা করিলে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়; কাব্যশাস্ত্রের চর্চ্চা করিলে ভাব বৃদ্ধি হয়। মনে করিলে জ্ঞানালোচনায় বিমুখ থাকিতে পারি, অথবা কাব্যরসের আস্বাদ গ্রহণ না করিতে পারি; কিন্তু ফলাফলের উপর আমাদের কোন হাত নাই।

অন্তর বাহিরে কোথাও ফলাফলের উপর হাত নাই। আমরা আমাদের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিচালনা করিতে পারি। কিন্তু তাঁহার ফল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়, আমি হোক্ বলিলে হয় না। এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক।

কার্য্যকারণসম্বন্ধ, মানবের ইচ্ছাশক্তিসাপেক্ষ নহে বলাতে অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে, ইচ্ছাশক্তি নিজেই কারণ হইয়া কার্য্য উৎপন্ন করিতে পারে না, অথবা জগতের কার্য্যকারণ-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া প্রাকৃতিক ঘটনা নিচয়ের মধ্যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করিতে পারে না। যদি এমনও কেহ বলেন যে, মনুষ্য অগ্নির মধ্যে হস্ত দিয়াও আপনার মানসিক শক্তির বলে হস্ত দগ্ধ হওয়া নিবারণ করিতে পারেন, তাহা হইলেও যাহা বলা

হইতেছে, তাহা অযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, কার্য্যকারণের নিয়ম অক্ষুণ্ণই থাকে। সেই নিয়ম আমার ইচ্ছাধীন নহে। উহার সত্তা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

আমার ইচ্ছায় হয় না, কোন মানুষের ইচ্ছায় হয় না, তবে কাহার ইচ্ছায় হয়? তুমি বলিবে, প্রাকৃতিক নিয়মে হয়; কিন্তু নিয়মের অর্থ কার্য্যপ্রণালী। কাহার কার্য্যপ্রণালী? তুমি বলেবে, প্রাকৃতিক কার্য্যপ্রণালী। প্রকৃতি কাহার নাম? প্রকৃতি বলিয়া কি কোন ব্যক্তি আছে? যদি বল যে, যে প্রণালীতে জগতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহারই নাম প্রকৃতি, তাহা হইলে প্রকৃতির নিয়ম শব্দের অর্থ কি হইবে? জগতের কার্য্যপ্রণালীর কার্য্যপ্রণালী!! আবার বলি এ নিয়ম বা কার্য্যপ্রণালী কাহার? যদি বল, প্রকৃতির অর্থ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী মহাশক্তি, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, ঐ মহাশক্তি কি পদার্থ?

এস্থলে আর একটি কথা বলি। বিজ্ঞান বা নাস্তিকতার ভাষায় যাহাকে প্রাকৃতিককার্য্য বলে, ধর্ম্মের ভাষায় তাহা পরমেশ্বরের কার্য্য। ঈশ্বরবিশ্বাসীর নিকটে প্রকৃতির সকল কার্য্যই পুরুষের কার্য্য। অগ্নিতে দগ্ধ হয়, জল শীতল করে, এই দুইটী বিষয় বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে হইলে বলিব, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, জল শীতল করিতেছে। কিন্তু উহা ধর্ম্মের ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিতে হইলে বলিব, পরমেশ্বর অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতেছেন, জলদ্বারা শীতল করিতেছেন। তিনি জগতের প্রাণ, জগতের আধারভূতাশক্তি। লোকে যাহাকে প্রাকৃতিককার্য্য বলে,

সে সকলই তাঁহার কার্য্য। প্রাকৃতিকশক্তি ও ঐশীশক্তি একই পদার্থ। প্রকৃতি বলিয়া কোন পদার্থ বা ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করি না। এক ঐশীশক্তি বহির্জ্জগতে ও অন্তর্জগতে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে।

প্রকৃতি ও ঈশ্বর, এই উভয়ের স্বতন্ত্র সত্তা কল্পনা মাত্র। পরমেশ্বরের কার্য্য ও প্রকৃতির কার্য্যের মধ্যে দ্বৈতবাদ একান্ত অযুক্ত। প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, ঐ প্রকার পার্থক্যবোধ ভ্রমাত্মক ও অনিষ্টকর। ঐশীশক্তি ভিন্ন, জগতের অন্তর্গত, স্বতন্ত্র এক অন্ধশক্তির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইলে উক্তরূপ দ্বৈতবাদ সমর্থিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা কখনই সম্ভব নহে। অন্ধশক্তি অর্থশূন্য বাক্য।

সকলেই স্বীকার করেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল ঘটনা, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত এক মহাশক্তির কার্য্য। কিন্তু উহার স্বরূপ কি? উহা অন্ধশক্তি না জ্ঞানময়ীশক্তি? এই প্রয়োজনীয় তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইলে, শক্তিতত্ত্ব বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। শক্তির জ্ঞান আমাদের কিরূপে উৎপন্ন হয়? বহির্জগতে ঘটনাপরম্পরা প্রত্যক্ষ করি, শক্তি কোথায়? বহির্জগতে ইন্দ্রিয়বোধ (Sensation) ব্যতীত আর কিছুই প্রত্যক্ষীভূত হয় না, শক্তি কোথায়? অন্তর্জগতে শক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়। আত্মশক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি না। বহির্জগতে শক্তি কার্য্য করিতেছে, বিশ্বাস করি। আত্মশক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তি যখন প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, আত্মশক্তি হইতেই শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। আরও

একটী কথা বলিতে হইবে যে, বহির্জগতে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা আত্মশক্তির সদৃশ। সাদৃশ্য না থাকিলে উভয়কেই এক নাম দেওয়া যায় না; সুতরাং বলিতে হইবে যে, বহির্জগতে যে শক্তির কার্য্য হইতেছে, উহা জ্ঞানময়ীশক্তি।

যে গুণ থাকিলে কার্য্য করিতে পারা যায়,তাহার নাম শক্তি। বহির্জগতে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী ঘটনা। শক্তি কোথায়? আমাদের কর্ত্তৃত্ব বা শক্তি আছে। কর্ত্তৃত্ব বা শক্তি কেবল আত্মারই গুণ। সুতরাং যেখানে কর্ত্তৃত্ব বা শক্তি সেখানেই আত্মা।

জগতে দুই প্রকার শক্তি দেখিতেছি। এক জীবাত্মার নিজ শক্তি, আর এক ব্রহ্মাণ্ডের (বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে) অন্তর্গত মহাশক্তি। প্রথমটী হইতে দ্বিতীয়টীর জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছি।

আত্মশক্তি হইতে যে, শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি স্বীকার করিতে চাহেন না। সুতরাং একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের ভিতরে যে ভাব নাই, বাহিরে তাহা থাকিলেও কি আমাদের পক্ষে তাহার জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে? যদি আমার দয়া, প্রেম প্রভৃতি ভাব বা বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কি অন্যের দয়া, প্রেম প্রভৃতি কিছু মাত্র বুঝিতে পারিতাম? "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে", অর্থাৎ আমার ভিতরে যে ভাব আদৌ নাই, তাহা বাহিরে থাকিলেও, আমার পক্ষে থাকা না থাকা সমান, উহার বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান (idea) সম্ভব নহে।

যে যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, অন্ধশক্তি অসম্ভব, শক্তি বলিলেই জ্ঞানময়ীশক্তি হইবে, সেই যুক্তিটীর সমুদয় অংশগুলি একটি একটি করিয়া বলিতেছিঃ—

(১) বহির্জগতে ইন্দ্রিয়বোধ (Sensation) ব্যতীত আর কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। শারীরিক ইন্দ্রিয়দ্বারা শক্তির জ্ঞান লাভ হয় না।

(২) কেবল অন্তর্জগতে আত্মজ্ঞানদ্বারা শক্তির জ্ঞান লাভ করা যায়।

(৩) আত্মজ্ঞানদ্বারা যে শক্তিকে জানি, তাহা জ্ঞান-পদার্থ;—তাহা মানবাত্মার একটী গুণ বা অবস্থা।

(৪) আর কোন প্রকার শক্তির জ্ঞান বা ভাব আমাদের নাই, শক্তি বলিলেই আত্মার শক্তি বুঝি।

(৫) আমাদের নিজ শক্তি হইতে পৃথক্ কোন শক্তি মানিতে হইলে তাহা আত্মার শক্তি বা গুণ বলিয়াই মানিতে হইবে;—কেননা আত্মার শক্তি হইতেই আমাদের শক্তির জ্ঞান লাভ হইয়াছে।

(৬) বহির্জগতে শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না, সুতরাং বহির্জগতে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহাও আত্মার শক্তি, জ্ঞানময়ীশক্তি। *

শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে এত কথা বলিলাম কেন? প্রার্থনাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে, তাহার সহিত উহার সম্বন্ধ কি? এখন তাহাই দেখাইব। আমরা কাজ করি বটে, কিন্তু ফলাফল আমাদের হস্তে নাই। বহির্জগতে যে সকল ঘটনা বা কার্য্য হইতেছে—তাহা আমাদের ইচ্ছানিরপেক্ষ,

---

* এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে, সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছে। Roots of faith এবং 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা', প্রথম ভাগ, দেখ। উক্ত পুস্তকদ্বয়ে এই বিষয়টী বিশেষরূপে সমালোচিত হইয়াছে।

ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। অন্তর্জগতে আসিয়া দেখি, আমরা মনোবৃত্তি পরিচালনা করি বটে, কিন্তু উহার ফল স্বভাবতঃ লাভ করি; অর্থাৎ প্রাকৃতিকশক্তিদ্বারা লাভ করি। কিন্তু এই প্রাকৃতিকশক্তি যাহা বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে, তাহা অন্ধশক্তি নহে, জ্ঞানময়ী শক্তি, আত্মার শক্তি।

এখন দেখ, আমি প্রার্থনা করিলাম; উহাতে আধ্যাত্মিক মঙ্গল লাভ হইল। প্রার্থনা আমি নিজে করি। কিন্তু প্রার্থনার ফল আসে, হয়; উহা আমি সৃষ্টি করি না, তবে উহা কোথা হইতে আসে? কে উহা প্রেরণ করেন? প্রার্থনার ফল যখন আমার নিজের সৃষ্টি নহে, তখন ইহা বলিতে হইবে যে, উহা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনীজ্ঞানময়ীমহাশক্তির কার্য্য;—পরমেশ্বরের কার্য্য। যাহা জীবের কার্য্য নহে, তাহা ব্রহ্মের কার্য্য। সুতরাং প্রার্থনার ফলদাতা স্বয়ং পরমেশ্বর।

প্রার্থনা করিয়া যাহা পাই, তাহা মনোবৃত্তি পরিচালনার ফল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও বলিতে হইবে যে, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎদান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কেবল প্রার্থনা বিষয়ে কেন? সকল বিষয়েই ঐরূপ। আমি জ্ঞানগর্ভগ্রন্থ পাঠ করিলাম;—জ্ঞানালোক লাভ করিলাম, আমার বুদ্ধি বৃত্তিনিচয় পরিপুষ্ট হইল। পুস্তক পাঠ করা নিজের কার্য্য, কিন্তু উহা পাঠ করিয়া যে ফল পাইলাম, তাহা প্রকৃতির কার্য্য, অর্থাৎ পরমেশ্বরের কার্য্য।

কাব্যশাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া হৃদয়ে ভাবের সঞ্চার হইল। চর্চ্চা করা আমার কার্য্য; কিন্তু ভাবসঞ্চার মানসিক নিয়মের ফল, অর্থাৎ পরমেশ্বরের কার্য্য।

একটী বক্তৃতা বা সঙ্গীত শুনিয়া আমার মন ভাল হইল; শ্রবণ করা আমার কার্য্য, কিন্তু মন ভাল হওয়া স্বাভাবিক নিয়মের ফল বা পরমেশ্বরের কার্য্য। সকল বিষয়েই এইরূপ। প্রকৃতির কার্য্য ও পরমেশ্বরের কার্য্যের মধ্যে দ্বৈতবাদ মানি না। স্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য মানি না। যাহা আধ্যাত্মিক, তাহা সমগ্রস্বভাবরাজ্যের একটী বিভাগ মাত্র। এক ভাবে বলা যায় যে, যাহা প্রাকৃতিক, তাহাই আধ্যাত্মিক, কেন না, এক মহান্ আত্মা সমগ্রপ্রকৃতির প্রাণ ও শক্তি; সকলই তাঁহার কার্য্য।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা"

তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে কলের মধ্যে ফেলিয়া মানুষ করেন না, কলে দুধ খাওয়ান না। মহাকার্য্যশালিনীমহাশক্তি, জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী, আপনার অগণ্য, অসংখ্য সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া সাক্ষাৎভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, নিরন্তর তাহাদের কর্ম্মফল বিধান করিতেছেন।

এখন প্রার্থনাবিরোধী জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে প্রার্থনার বিশেষত্ব কি রহিল? পরমেশ্বরের দিকে কিছুই বিশেষত্ব নাই। আমাদের পক্ষেই বিশেষত্ব। অগণ্য অসংখ্য পথ দিয়া আমরা তাঁহার কৃপা লাভ করিতেছি। জ্ঞানচর্চ্চা করি, ধর্ম্মপরায়ণ হই, সৎকথা বা সঙ্গীত শ্রবণ করি, অথবা প্রার্থনা করি, যাহাই কেন করি না, যে কোন প্রণালী দিয়া তাঁহার করুণাস্রোত অবতরণ করিতে পারে। তাঁহার পক্ষে সকলই সমান। আমাদের পক্ষে আমরা কোন একটী বিশেষ উপায়ে তাঁহার করুণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

প্রার্থনার ফল, প্রত্যক্ষ সত্য।

অনেকেই বলেন, প্রার্থনা করিতে পারি না; প্রকৃত প্রার্থনা কেমন করিয়া হইবে? আপনার অভাব ও তাঁহার দয়া চিন্তা কর। প্রার্থনা আপনি আসিবে। জ্বলন্ত হৃদয়ে জ্বলন্ত প্রার্থনা, স্বর্গের সিংহাসনকে বিচলিত করে। যে হস্ত নিখিলব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছে, জীবন্ত সরল প্রার্থনা সেই হস্তকে জীবের মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত করে। তখন জীব সুস্পষ্ট অনুভব করে যে, এক উচ্চতর শক্তি তাহার অন্তর রাজ্যকে আলোড়িত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছে—এক স্বর্গীয় অগ্নি তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্ব প্রকার পাপ জঞ্জাল ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে। প্রার্থনাশীল ইহা প্রত্যক্ষ করেন। একটি বাস্তব ঘটনা সহস্র তর্ককে চূর্ণ করিয়া দেয়। প্রার্থনাশীল যখন আপনার অন্তরে পরমেশ্বরের হস্ত প্রত্যক্ষ করেন, তখন আর দার্শনিক তর্কের প্রয়োজন থাকে না। যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আপনার অন্তরে অনুভব করিতেছি, তুমি সহস্র তর্ক করিলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারিব না।

তুমি যদি তর্ক করিয়া প্রমাণ করিতে পার যে, চিনি তিক্ত, তাই বলিয়া চিনি সত্য সত্যই তিক্ত হইবে না। তোমার মুখে যদি তিক্ত বোধ হয়, তাহাতে কেবল এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, তুমি পীড়িত হইয়াছ, তোমার রসনা অরুচিরোগে রুগ্ন। যদি আমি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া থাকি, তুমি আমাকে ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া প্রমাণ করিলেও আমি সে কথা গ্রাহ্য করিতে পারি না। বহির্জগতের ঘটনা ইন্দ্রিয়বোধদ্বারা জানিতে

পারি। অন্তর্জগতের ঘটনা সংজ্ঞা (consciousness) দ্বারা জানি। অন্তরে যাহা সঙ্ঘটিত হয়, আন্তরিক প্রত্যক্ষ অপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কি আছে? দার্শনিক জানেন, দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনে কি ফল। অন্য লোকে কি বুঝিবে? কবি জানেন, কাব্য রসের আস্বাদনে কি হয়। অন্য লোকে কি বুঝিবে? প্রার্থনাশীল জানেন, প্রার্থনায় কি হয়। অন্য লোকে কি বুঝিবে? সকল দেশের, সকল যুগের সাধুগণ এক-তানে বলিতেছেন, প্রার্থনা স্বর্গের মন্দাকিনীকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করে। তাহার পবিত্রস্পর্শে পতিত মানবসন্তান উদ্ধার হইয়া চলিয়া যায়। সেই মন্দাকিনী জলে অবগাহন কর, সহস্র প্রকার দার্শনিক তর্কে যাহা হয় নাই, তাহাই হইবে, তোমার সংসারযন্ত্রণা চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে।

প্রকৃত শাস্ত্র।

ব্রাহ্মের শাস্ত্র কি? প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর যেমন বেদ, মুসলমানের যেমন কোরান, খৃষ্টিয়ানের যেমন বাইবেল, সেই-রূপ ব্রাহ্মের শাস্ত্র কি? শাস্ত্র স্বীকার না করিলে ধর্ম্ম হয় না। শাস্ত্ররূপ ভিত্তিমূলে ধর্ম্মরূপ অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্ম যদি শাস্ত্র স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

মনুষ্যের একান্ত চঞ্চল মানসিক ভাবের উপর যে ধর্ম্ম নির্ভর করে, তাহা ধর্ম্মই নহে। বালির উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর, তাহা কয়দিন থাকিবে? সাগরতরঙ্গের ন্যায় মনুষ্যের মন

নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। সেই পরিবর্ত্তনশীল, চঞ্চল মনের উপর যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহা কি কখন স্থায়ী হইতে পারে? সে ধর্ম্ম কি ধর্ম্মনামের যোগ্য? প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীগণ অনেকে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঐরূপ অনেক কথা বলিয়া থাকেন।

ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্মগ্রন্থ ও মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান।

কোন কোন ব্যক্তি এতদুর পর্য্যন্ত বলেন যে, পরমেশ্বর-প্রেরিত অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন সত্যই মানুষ জানিতে পারে না। মানুষ স্বভাবতঃ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত। পরমেশ্বরপ্রেরিত অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটি তত্ত্বও স্বভাবতঃ উপলব্ধি করিতে অথবা জ্ঞানবলে আবিষ্কার করিতে পারে। এমন কি, কোন অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত এই জগতের স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তাহাও মানুষ কেবল আপনার স্বাভাবিক শক্তিবলে কখনই জানিতে পারিত না।

তোমার দূরদেশগত পিতার নিকট হইতে পত্র আসিল। পিতার পত্র বলিয়া তুমি তাহা আদরে গ্রহণ করিলে। এস্থলে তুমি অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই জান যে, তোমার একজন পিতা আছেন; নতুবা উপস্থিত পত্রখানি পিতার পত্র বলিয়া তুমি কেমন করিয়া মনে করিতে পার। পত্র পাইবার পূর্ব্ব হইতে পিতার অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকিলে পত্রখানিকে পিতার পত্র বলিয়া তুমি কখনই গ্রহণ করিতে পারিতে না।

তুমি পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে। তাহাতে যাহা কিছু লেখা আছে, সকলই বিশ্বাস করিলে। কেন? কেন না

তুমি জান যে, তোমার পিতা সত্যবাদী ;—মিথ্যা কথা লিখিয়া তোমাকে প্রতারণা করিবার লোক নহেন। তবে পত্রে কি কোন ভুল থাকিতে পারে না? অবশ্যই পারে; কেন না মনুষ্যের পক্ষে ভ্রান্তি সম্ভব।

এই পত্র সম্বন্ধে যেমন, পরমেশ্বরপ্রেরিত অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধেও সেইরূপ। যদি পরমেশ্বর মানুষের মঙ্গলের জন্য এক-খানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠাইয়া দেন, তুমি কেমন করিয়া মনে করিবে যে, উহা পরমেশ্বরপ্রেরিত? পূর্ব্ব হইতে তোমার অবশ্য জানা চাই যে, একজন পরমেশ্বর আছেন, নতুবা প্রেরিত গ্রন্থকে তাঁহার গ্রন্থ বলিয়া মনে করা কি কখন সম্ভব?

তুমি গ্রন্থ পাঠ করিলে। তাহাতে যাহা কিছু লেখা আছে, সকলই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে। কেন? যিনি গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তিনি কি কতকগুলা মিথ্যা কথা লিখিয়া তোমাকে ঠকাইতে পারেন না? গ্রন্থখানি কি প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যা কথায় পূর্ণ হইতে পারে না? তুমি একথার উপরে যদি বল যে, প্রেরিতশাস্ত্রগ্রন্থেই যখন স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে যে, পরমেশ্বর সত্যবাদী, তখন ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, তিনি মিথ্যা কথা লিখিয়া কখনও মনুষ্যকে প্রতারণা করেন নাই। কিন্তু কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হইয়াও আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া কি লিখিয়া দিতে পারে না? আমি মিথ্যাবাদী হইয়াও কি লিখিয়া দিতে পারি না যে, আমি সত্যবাদী? ধর্ম্মশাস্ত্রে পরমেশ্বর সত্যবাদী বলিয়া লেখা আছে বলিয়াই যে, পরমেশ্বর সত্যবাদী, ইহা অতি অসার কথা। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, সে সহস্র প্রকারে লোককে জানায়

যে, সে সত্যবাদী। পিতার সত্যবাদিত্বে পূর্ব্ব হইতে বিশ্বাস আছে বলিয়া তাঁহার পত্রে লিখিত কথায় তুমি বিশ্বাস করিতেছ। নতুবা করিতে না। সেইরূপ যদি পরমেশ্বর কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠাইয়া দেন, প্রেরয়িতার সত্যপরায়ণতায় পূর্ব্ব হইতে বিশ্বাস না থাকিলে সে গ্রন্থ-লিখিত বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার না।

পিতার পত্র পাইয়া মনে করিতে পার যে, উহাতে ভুল আছে ; কেননা মানুষ স্বভাবতঃ ভ্রান্ত ; কিন্তু যে গ্রন্থকে ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছ, উহাকে অভ্রান্ত বল কেন ? পরমেশ্বর অভ্রান্ত, সুতরাং তাঁহার প্রেরিত শাস্ত্রও অভ্রান্ত, ইহাই অবশ্য তুমি বলিবে। কিন্তু আমরা যে পরমেশ্বরকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহার মূল কোথায় ? যদি বল ধর্ম্মশাস্ত্রেই উহা লেখা আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রই উহার মূল, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন ব্যক্তি ভ্রান্ত হইয়াও কি আপনাকে অভ্রান্ত বলিতে পারে না ? ধর্ম্মগ্রন্থে আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া লিখিয়া দিতে পারে না ? আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া কি কাহারও ভ্রান্তি জন্মিতে পারে না ?

এখন দেখ, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার অভ্রান্ততা সকলই অন্যপ্রকার প্রমাণের উপর নির্ভর করিল। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে বলিয়া এ কয়েকটা সত্যের কোনটাই আমাদের গ্রাহ্য হইতে পারিল না। উহার অন্য প্রমাণ চাই। উহার ভিত্তিমূল অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার স্বরূপের প্রধান প্রধান কয়েকটা লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রনিরপেক্ষ

হইল, তবে বাকি রহিল কি? ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার প্রধান প্রধান স্বরূপ-লক্ষণ স্বীকার করিয়া লইলে প্রায় সমুদয় প্রয়োজনীয় তত্ত্বই—উপাসনা,পরলোক প্রভৃতি—তাহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতে পারে। তবে দেখ, ঈশ্বরপ্রেরিত অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্যসকল মানুষ জানিতে পারে না, সে কথা কোথায় থাকিল?

এত ভাল যে, মানুষ তাহা পারে না।

অভ্রান্ত শাস্ত্রের প্রমাণ কি? বেদ বা বাইবেল বা কোরাণ বা অন্য কোন বিশেষ গ্রন্থ যে, পরমেশ্বরপ্রণীত অভ্রান্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র, ইহার প্রমাণ কি? প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশ্বাসী, তাঁহার অবলম্বিত বিশেষ শাস্ত্রকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য, এই একটী প্রমাণ প্রদর্শন করেন যে, উহা এত ভাল যে,মনুষ্য কখনই তত ভাল গ্রন্থ রচনা করিতে পারে না। বেদকে যিনি অপৌরুষেয় শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি বলিবেন যে, মানুষ কখনই সেরূপ সারবান্ ও জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ লিখিতে পারে না। খৃষ্টিয়ান বলিবেন, মনুষ্য যতই কেন আশ্চর্য্যক্রিয়া সম্পন্ন করুক না, বাইবেলের ন্যায় গ্রন্থরচনা মনুষ্যশক্তির অতীত কার্য্য। মুসলমান বলিবেন যে, কোরানের রচনাপারিপাট্য এমন সুন্দর, তাহার উপদেশ এমন চমৎকার যে, মানুষের পক্ষে উক্তরূপ গ্রন্থপ্রণয়ন অসম্ভব কার্য্য।

কিন্তু একথায় সন্তুষ্ট হইতে পারি না। সহজেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—কেমন করিয়া জানিলে যে, মানুষ পারে

না? মানুষ পারে কি পারে না, ইহার মীমাংসা করিতে হইলে, মনুষ্যশক্তির সীমানিরূপণ করা আবশ্যক।

মনুষ্যশক্তির সীমা কোথায়? মানুষের ক্ষমতা কতদূর যায়? এ সমস্যার মীমাংসা কে করিবে? একজন মনুষ্যের পক্ষে যাহা অসম্ভব, আর একজনের পক্ষে তাহা সম্ভব। এক সময়ে মনুষ্যের পক্ষে যাহা অসম্ভব, আর এক সময়ে তাহাই সম্ভব। তবে মনুষ্য-শক্তির সীমা কেমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে? মানবাত্মার মধ্যে পরমেশ্বর যে সকল শক্তির বীজ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা উপযুক্তরূপে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইলে, তাহা হইতে যে, কিরূপ অমৃতফল প্রসূত হইতে পারে, সেই সকল শক্তির বিকাশ হইলে মানুষ যে কতদূর আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে, জ্ঞান ও ধর্ম্মপথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে, কে তাহা নিরূপণ করিবে? পুরাবৃত্ত পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্য দান করিয়াছেন যে, এক সময়ে যাহা মনুষ্যশক্তির অতীত বলিয়া কল্পিত হইত, অন্য সময়ে তাহাই মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত বলিয়া সুসভ্য জগতের সম্মুখে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ইংলণ্ডের রাজা ক্যানিউটের (Canute) গল্প সকলেই জানেন। ক্যানিউট্ তাঁহার তোষামোদকারী সভাসদ্‌গণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়, তাঁহারা বলিলেন,—"মহারাজ! আপনার ক্ষমতা সর্ব্বত্র বিস্তৃত,—ঐ সমুদ্র পর্য্যন্ত আপনার আদেশ পালন করে।" ধার্ম্মিক ক্যানিউট্ তখন জলের নিকটবর্ত্তী হইয়া গম্ভীর ধ্বনিতে বলিলেন,—হে সমুদ্র! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি ঐ পর্য্যন্ত আসিবে, আর আসিবে না।" সমুদ্র ইংলণ্ডাধিপতির কথা শুনিল না। প্রবল

তরঙ্গাঘাতে তাঁহার নিজের ও তাঁহার সভাসদ্‌বর্গের পরিচ্ছদ আর্দ্র করিয়া দিল। তখন ক্যানিউট্‌ সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কোন মানুষ,—কোন পার্থিব রাজার কথা সমুদ্র শুনে না। যিনি রাজার রাজা, সমুদ্র তাঁহারই আদেশ পালন করে।"

সেইরূপ কেহ মানবীয় শক্তির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। "ঐ পর্য্যন্ত আসিবে আর আসিবে না," মানবীয় শক্তি এ কথা কখন শুনে না। কত রাজা, সম্রাট্‌, গুরু, পয়গম্বর, ধর্ম্মপ্রয়োজকের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবীয় শক্তি চিরদিন অগ্রসর হইতেছে।

অপ্রাকৃতিকক্রিয়া ও ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্মশাস্ত্র।

অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া (Miracle) অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের আর একটি প্রমাণ। কিন্তু কোন্‌টি অপ্রাকৃতিকক্রিয়া এবং কোন্‌টি প্রাকৃতিককার্য্য বা ঘটনা, তাহা কে নিরূপণ করিবে? অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া কাহাকে বলে? প্রকৃতির নিয়ম অতিক্রম করিয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কি এবং কি নয়, তাহা কি মানুষ সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছে? কে বলিবে প্রকৃতির আরম্ভ কোথায় ও শেষ কোথায়? কে তাহা নির্দ্দেশ করিবে? তবে কোন্‌টি প্রাকৃতিক কার্য্য এবং কোন্‌টি বা অপ্রাকৃতিক কার্য্য, কেমন করিয়া তাহা স্থির হইবে? যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, কোন একটি বিশেষ কথা মহাভারতগ্রন্থে কুত্রাপি নাই, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তিনি সমগ্রমহাভারত পাঠ করিয়াছেন। মহাভারতে কোথায় কি আছে, বিশেষ করিয়া না জানিলে

উক্তরূপ কথা বলিবার কাহারও অধিকার হয় না। সেইরূপ, সমগ্র প্রকৃতিগ্রন্থ পাঠ না করিলে,—উহার কোথায় কি আছে, বিশেষ করিয়া না জানিলে,—কোন বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে কেহ বলিতে পারেন না যে, উহা প্রকৃতির অন্তর্গত নহে, অথবা প্রকৃতির সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া উহা সংঘটিত হইয়াছে।

এক সময় ছিল, যখন রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের কথা কেহ কল্পনা করিয়া বলিতে পারিলেও তাহা উপন্যাস অপেক্ষা অদ্ভুত বলিয়া গণ্য হইত। আমার প্রপিতামহের নিকট যদি কেহ বলিতেন যে ভবিষ্যতে এমন এক যন্ত্রের সৃষ্টি হইবে, যদ্দ্বারা লোকে সপ্তদশ ঘণ্টার মধ্যে হুগলি হইতে বারানসীধামে গমন করিতে পারিবে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তাহাকে কবিরাজ মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিতে পরামর্শ দিতেন। যদি কেহ আমাদের পিতৃপিতামহগণকে বলিত যে, কলিকাতায় বসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে লাহোরের সংবাদ পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার জন্য কিঞ্চিৎ বিষ্ণু তৈলের ব্যবস্থা হইত। রেলওয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা মহাত্মা জর্জ ষ্টিফিন্‌সন যখন সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে রেলওয়ে নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন, তখন (সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক) প্রধান প্রধান পণ্ডিত দিগের নিকটেও তিনি বাতুল বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইংরেজিতে একটী কথা আছে,—"Truth is stranger than fiction;" —সত্য, উপন্যাস অপেক্ষাও আশ্চর্য্য। অদ্য যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ, কল্য তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম-সিদ্ধ। অদ্য যাহা Miraculous, কল্য তাহাই Natural। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সহকারে অপ্রাকৃতিক ঘটনা নিচয়, প্রাকৃতিক বলিয়া পরিগণিত

হইতেছে। বিজ্ঞানের চর্চ্চা সে দিন আরম্ভ হইল। প্রকৃতিরূপ মহাসাগরের এক কণিকাও এখন সর্ব্বতোভাবে মানববুদ্ধির আয়ত্তাধীনে আসে নাই। নিউটনের ন্যায় বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিকেরাও "বেলাভূমিতে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণব তাঁহাদের পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থবাদীদিগের যুক্তি এই,মানুষ কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না। যিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা তাঁহাতেই সে শক্তি বর্ত্তমান। তিনি মনে করিলে মানুষকেও তাহা প্রদান করিতে পারেন। পুরাকালে যে সকল মহাপুরুষেরা অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, হয় তাঁহারা পরমেশ্বরের অবতার, নতুবা তাঁহারা ঐশীশক্তিসম্পন্ন প্রেরিতমহাজন। সুতরাং তাঁহারা যদি কোন বিশেষ গ্রন্থকে অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা অবশ্যই অভ্রান্ত বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে।

উহার উত্তরে সহজেই কেহ বলিতে পারেন যে, প্রাচীন কালের মহাপুরুষগণ বাস্তবিক যে, অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? অধুনাতন প্রমাণসম্বন্ধীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রানুসারে (Modern Law of evidence) কেহ কি তাহা সাব্যস্ত করিতে পারেন? কিন্তু আমি সেরূপ কোন প্রশ্ন করিব না। যখন কোন্‌টী প্রাকৃতিক ঘটনা এবং কোন্‌টী অপ্রাকৃতিক ঘটনা, ইহা নিরূপিত হওয়া অসম্ভব, তখন অপ্রাকৃতিক ঘটনার উপরে অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা, এবং শূন্যের উপরে গৃহনির্ম্মাণ করা উভয়ই সমান।

অলৌকিক ক্রিয়াতে অলৌকিক শক্তি প্রকাশিত। কিন্তু শক্তির সহিত পবিত্রতার অবশ্যম্ভাবী বা চিরস্থায়ী সম্বন্ধ নাই। পাপ ও পুণ্য উভয়েরই সহযোগে শক্তি অবস্থিতি করে। কোন অদ্ভুত কার্য্য দেখিলে তাহাতে নিশ্চয়ই শক্তি অনুভব করি। কিন্তু উহা দেবশক্তি কি পিশাচশক্তি কে তাহা মীমাংসা করিয়া দিবে? আমাদের দেশে চিরকাল পিশাচসিদ্ধ বলিয়া এক প্রকার শক্তিশালী লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। অদ্ভুত ক্রিয়ার জন্য তাহারা প্রসিদ্ধ। কিন্তু অদ্ভুত ক্রিয়াশক্তি থাকিলেও পবিত্রতা বা সাধুতার জন্য তাহারা খ্যাত নহে। অপবিত্রতার সহিত অসামান্য ক্ষমতা যে একত্রে থাকিতে পারে, ইহা পৃথিবীর সকল দেশের লোকই চিরকাল বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। প্রচীন য়িহুদিদিগের মধ্যেও ঐরূপ সংস্কার ছিল। সেই জন্য তাঁহারা মহাত্মা যীশু খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়ার বিষয়ে বলিতেন যে, তিনি উহা বেইলজিবব (Beelzebub) নামক উপদেবতার সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে হোসেন খাঁর অদ্ভুত ক্রিয়া অনেকেই দেখিয়াছেন। হোসেন খাঁ বলিতেন যে, তিনি প্রেত বিশেষের সাহায্যে ঐ সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন একবার আমাদিগের নিকট হোসেন খাঁর আশ্চর্য্য ক্রিয়া কলাপের গল্প করিয়া পরিশেষে বলিলেন "কেমন করিয়া এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

কেশব বাবুর ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুঝিতে পারিলেন না! এস্থলে কেশব বাবুর কি করা উচিত ছিল? গললগ্নীকৃতবাসে হোসেন খাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কি বলা উচিত

ছিল না,—"হে অলৌকিক ক্রিয়াকারী প্রভু হোসেন খাঁ! আপনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎঅবতার; আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।"

কেহ বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, হোসেন খাঁর কার্য্য নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ নহে। কেহ কোন অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে যদি আমি উহা বুঝিতে না পারি, প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকেরা বুঝিবেন। এমনি যদি হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চতম বৈজ্ঞানিকও উহার রহস্যোদ্ভেদ করিতে অক্ষম হন, তাহাতেই বা কি? উনবিংশ শতাব্দী যাহা পারিল না, পঞ্চবিংশ শতাব্দী তাহা করিতে পারে। ক্রমেই নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে। পৃথিবীর এখন বাল্যাবস্থা! বিজ্ঞানের উন্নতি গত কল্য আরম্ভ হইয়াছে! এক সময়ে যাহা মনুষ্যের পক্ষে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, এখন তাহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বিষয়! আমাদের পক্ষে যাহা স্বপ্নের অগোচর, ভাবী বংশীয়দিগের পক্ষে তাহাই প্রতিদিনের প্রত্যক্ষীভূত সামান্ত ঘটনা! প্রকৃতিদেবী মনুষ্যের নিকটে তাঁহার অনন্ত রত্ন-ভাণ্ডার ক্রমে ক্রমে খুলিয়া দিতেছেন।

যোগসাধনদ্বারা যে, অসামান্ত শক্তির বিকাশ হয়, একথা আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত। যোগীগণ বলেন যে, যোগ দ্বিবিধ। শক্তির জন্ত যোগ ও মুক্তির জন্ত যোগ। যাহাতে অসামান্ত শক্তি লাভ হয়, কেবল তজ্জন্তই এক শ্রেণীর যোগী যত্নশীল থাকেন। আস্তিক যোগের ন্যায় নাস্তিক যোগও আছে।

পঞ্জাবের যোগীর অদ্ভুত কথা অনেকেই শুনিয়াছেন।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"রণজিৎ সিংহের রাজ্য পঞ্জাবেতে একজন যোগী দৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি যথেচ্ছাকাল পর্য্যন্ত মৃত্তিকা মধ্যে বাস করিতে পারিতেন। জেনেরল বেণ্টুরা নামক একজন ফরাসীশ ইহার প্রতি সন্দেহ করিয়া পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে মৃত্তিকা মধ্যে স্থাপিত করেন, এবং তিনি ও কাপ্তেন ওয়েব সাহেব তাঁহাকে মৃত্তিকা হইতে উত্থানকালে দৃষ্টি করেন। তাঁহার সংক্ষেপ বিবরণ এই, যথা; একদা সেই যোগী রণজিৎ সিংহের আদেশ অনুসারে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া এবং কর্ণ ও নাসিকারন্ধ্র এবং মুখ ভিন্ন অন্য অন্য শরীরদ্বার মধূচ্ছিষ্ট অর্থাৎ মোম দ্বারা বদ্ধ করিলেন, এবং এক পট্টের গোণী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জিহ্বা ব্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিদ্রিতবৎ হইলেন। তদনন্তর সেই গোণীর মুখ বন্ধন পূর্ব্বক তাহাতে রণজিৎ সিংহের নাম মুদ্রিত করিয়া তাঁহার লোকেরা তাঁহাকে সিন্দুক মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক বদ্ধ করিলেক, এবং সেই সিন্দুক মৃত্তিকা মধ্যে রক্ষা করিয়া তদুপরি যব বপন করিলেক। তাহার রক্ষণ জন্য সে স্থানে রক্ষক স্থাপিত হয়। দশ মাস পর্য্যন্ত সেই যোগী মৃত্তিকা মধ্যে মগ্ন ছিলেন, ইতি মধ্যে রণজিৎ সিংহ এবিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদ জন্য দুইবার সেই স্থান খনন করিতে অনুমতি করেন, এবং দুই বারই তাঁহাকে সমানরূপ অচেতন দেখেন। দশমাস পূর্ণ হইলে যখন তাঁহাকে উত্তোলন করা যায়, তখন তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রাণহীন বোধ হইয়াছিল। তাঁহার সমুদয় শরীর শীতল, কেবল ব্রহ্মরন্ধ্র অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। তদনন্তর প্রথমতঃ তাঁহার জিহ্বাকে আকৃষ্ট করিয়া সহজ অবস্থাতে আনয়ন করিলে এবং তাঁহাকে

উষ্ণ জলে স্নান করাইলে দুই ঘণ্টা মধ্যে তিনি পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইলেন। যৎকালে তিনি পৃথিবী মধ্যে মগ্ন থাকেন, তখন তাঁহার নখ কেশ প্রভৃতি বৃদ্ধি হয় না। তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মৃত্তিকা মধ্যে অবস্থিতি কালে পরমানন্দে মগ্ন থাকেন।"*

এই অদ্ভুত ক্রিয়াকারী যোগীর বিষয়ে দুটী কথা বলিব। প্রথমতঃ যোগীর কার্য্য যদি আধুনিক বিজ্ঞানদ্বারা ব্যাখ্যাত হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে কি তাঁহাকে পরমেশ্বরের অবতার অথবা পরমেশ্বরপ্রেরিত অভ্রান্ত মহাজন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? কখনই না। প্রতীক্ষা কর; বিজ্ঞান† অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া উহার গূঢ় রহস্য বুঝাইয়া দিবে। বর্ত্তমান মূর্খতা বা অক্ষমতা, ভাবীজ্ঞান বা ক্ষমতাকে অপ্রমাণ করে না।

পূর্ব্বে দুই প্রকার যোগীর কথা বলা হইয়াছে,—শক্তিপ্রার্থী ও মুক্তিপ্রার্থী। যাহাতে মোহবন্ধন ছিন্ন হয়, প্রেম ও ভক্তি উপার্জ্জিত হয়, ভগবানের সাক্ষাৎদর্শন লাভ হয়, তাহার জন্য তাঁহারা দেহ মন সমর্পণ করেন। শক্তির সহিত পবিত্রতার অবশ্যম্ভাবী (Necessary) সম্বন্ধ নাই। কোন ঘটনায় অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত দেখিলেই কখন মনে করা সঙ্গত নহে যে, উহা অপ্রাকৃতিক দৈব কার্য্য। অদ্ভুত অবোধ্য শক্তি, দেবত্বের চিহ্ন বা প্রমাণ নহে।

---

* W. G. Osborne's Court and Camp of Runjeet Sing, P. 124.

† এস্থলে বিজ্ঞানশব্দ জড়বিজ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ভৌতিক, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক;—সাংসারিক বা পারমার্থিক, সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞানই এস্থলে বিজ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

আপনার হৃদয়ের সহিত শাস্ত্রবাক্য মিলাইয়া লও।

অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদী বলিবেন, শাস্ত্র সত্য কিনা, সরল ভাবে আপনার হৃদয়ের সহিত মিলাইয়া দেখ। কিন্তু যদি মিলাইয়া দেখিতে গিয়া সকল স্থলে না মিলে, কি করিব? হিন্দু বলিতেছেন, মিলাইয়া লও; খৃষ্টিয়ান বলিতেছেন, মিলাইয়া লও; মুসলমান বলিতেছেন, মিলাইয়া লও; কাহার মতে মিলিবে? বেদ, বাইবেল, কোরান, যাহাই কেন পাঠ করিনা, কোন গ্রন্থই আমার হৃদয়ের সহিত সকল স্থলে মিলে না, তবে কি করিব? যাহা মিলে, তাহাই পরমেশ্বরের সত্য বলিয়া পরম সমাদরে মস্তকে ধারণ করিব।

অশেষ যত্নে প্রতিপালিত, অবাধ্য, পিতৃগৃহত্যাগী পুত্র, নানা কষ্টে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার গৃহে সমাগত হইলে, তাহার পিতা হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন; এবং পরিবারবর্গকে আনন্দ করিতে অনুমতি করিলেন। ইহাতে তাঁহার চিরানুগত অপর পুত্র,দুঃখ প্রকাশ করাতে তিনি বলিলেন, দেখ, তুমিতো আমার চিরকালই আছ; কিন্তু আজ আমি হারাধন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া আনন্দ করিতেছি। অনুতপ্ত পাপীর প্রতি ঈশ্বরের কৃপা বুঝাইয়া দিবার জন্য ঈশার এই আধ্যাত্মিকাটি হৃদয়ের কেমন গভীর স্থানে প্রবেশ করে। আবার যখন দেখি যে,ক্রোধোন্মত্ত জিহোবা ইস্রায়েলবংশীয়দিগকে বিনাশ করিবার সংকল্প করিতেছেন, এবং মুসা এই বলিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, উহা করিলে তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে এবং মিসরবাসীদিগের মধ্যে তাঁহার দুর্ণাম হইবে; যখন দেখি, জিহোবাও মুসার কথায় সংকল্পিত কার্য্য

হইতে নিরত হইতেছেন, তখন নূতন ও পুরাতন বাইবেলে পরমেশ্বর সম্বন্ধে এই দুইটি বর্ণনার মধ্যে প্রথমটি পাঠ করিয়া মোহিত হইয়া যাই, দ্বিতীয়টিতে হৃদয়ের ভাব তদনুরূপ হওয়া দূরে থাকুক, বরং অশ্রদ্ধারই উদয় হয়। হৃদয়ের সহিত যাহা মিলিবে, হৃদয়াভ্যন্তরে তাহা যত্নের সহিত রক্ষা করিব। নতুবা আর কি করিতে পারি?

সকল কথাই সত্য; সুতরাং অপৌরুষেয়।

অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদী বলেন যে, শাস্ত্রের সকল কথাই সত্য; সুতরাং শাস্ত্র অপৌরুষেয়। কোন গ্রন্থের সকল কথা সত্য হইলেই যে, উহা অপৌরুষেয় শাস্ত্র, তাহার প্রমাণ কি? কোন গ্রন্থে ভুল দেখিতে না পাইলেই কি বলিতে হইবে যে, উহা ঈশ্বরপ্রণীত বা ঈশ্বরপ্রেরিত? ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উহাতে একটাও ভুল দেখিতে না পাইলে কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, উহা অপৌরুষেয় শাস্ত্র? আদ্যোপান্ত ভ্রমশূন্য এরূপ গ্রন্থ রচনা করা কি মনুষ্যশক্তির অতীত কার্য্য? মানুষ কি ভ্রমশূন্য পুস্তক লিখিতে পারেনা? আমি পারি। মৎস্য জলে সাঁতার দেয়, পক্ষী আকাশে উড্ডীয়মান হয়, মনুষ্য দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়, চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিলে লোহিত বর্ণ হয়, এইরূপ নিঃসন্দেহ সত্য এমন অনেক কথা লিখিয়া যদি একখানি পুস্তক রচনা করি, উহা কি ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইবে? শাস্ত্রবাদী কি বলিবেন যে, উহা মনুষ্যশক্তিদ্বারা সম্পন্ন হয় নাই, আমি উহা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিয়াছি? কল্পিত গ্রন্থ নানাস্ত সামান্য কথায় লিখিত বলিয়া যদি আপত্তি কর, তবে জিজ্ঞাসা করি, কেহ যদি

নিশ্চিতরূপে প্রমাণীকৃত সর্ব্ববাদী-সম্মত বৈজ্ঞানিক সত্য সকলে পরিপূর্ণ একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, কেহ কি তাহা পরমেশ্বর-প্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবে?

শাস্ত্রের মধ্যে অনৈক্য।

কিন্তু দুটি বিপরীত কথা উভয়ই সত্য হইতে পারে না। যে সকল গ্রন্থ ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ে প্রচলিত, সে সকলই অসঙ্গতিদোষে পূর্ণ। অন্য শাস্ত্রের কথায় প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র সকলের মধ্যে গুরুতর অনৈক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা কেবল আমাদের কথা নহে, শাস্ত্রই একথা বলিতেছে। মহাভারতে বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে যে সকল প্রশ্ন করিতেছেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই যে, পন্থা কি? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন;—

বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না,
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং;
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।

বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতি সকল ভিন্ন ভিন্ন, তিনি মুনিই নহেন, যাঁহার মত ভিন্ন নহে। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত হইয়াছে, মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, তাহাই পন্থা। এই শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইতেছে যে,শাস্ত্র সকলের মধ্যে একতা নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, উহা অভ্রান্তরূপে ঈশ্বরানুপ্রাণিত মহাজনগণ কর্ত্তৃক রচিত? সত্যের সহিত সত্যের কখন বিবাদ নাই। সত্যের সহিত সত্যের চিরসামঞ্জস্য।

"তিনি মুনিই নহেন, যাঁহার মত ভিন্ন নহে," এই কথাটি

কেবল যে,শাস্ত্র সকলের অভ্রান্ততা বিনাশ করিতেছে, এমন নহে, বাস্তবিক উহার মধ্যে একটি সুন্দর ভাব রহিয়াছে। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্যের মতে চলে, যাহার নিজের স্বাধীন মত নাই, সে আবার মুনি কিসের? যে অন্যের ধামাধরা সে আবার মুনি কিসের? চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। যদি দশজন লোকের সকল বিষয়ে ঠিক্ এক প্রকার মত হয়, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, উহার মধ্যে এক জন চিন্তাশীল এবং নয় জন তাহার অনুগামী। যেখানে সকলেই চিন্তা করেন, সেখানে মতের সম্পূর্ণ একতা সম্ভবপর নহে।

"ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত হইয়াছে," গুহা শব্দে এস্থানে অন্তর বা হৃদয়। শাস্ত্রের অনেক স্থলে উক্ত শব্দ ঐপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইবে, ততক্ষণ প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। হৃদয়ে প্রবেশ কর,গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে নিমগ্ন হও,সেখানেই ধর্ম্মরত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

অনেকেই বলেন যে, আর্য্য পিতৃ-পুরুষেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি ভুল হইতে পারে? মহর্ষিগণ ভ্রমাত্মক মত লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? আমরা কি তাঁহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী হইয়াছি যে, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিব? কিন্তু যখন শাস্ত্রকারদিগের পরস্পর মতভেদ রহিয়াছে, তখন তাঁহারা সকলে অভ্রান্ত ছিলেন, এরূপ কথা কেমন করিয়া বলিব? শাস্ত্র সকলের মধ্যে যে, বিরোধ আছে, ইহা অভ্রান্ত-শাস্ত্রবাদী স্বীকার করিতে চাহেন না; কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। তোমার আমার

মত লোকের কথা হইলে উহা অগ্রাহ্য হইতে পারিত, কিন্তু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কথা কেমন করিয়া অগ্রাহ্য করিবে? অভ্রান্ত-শাস্ত্রবাদী হিন্দু হইয়া কে সাহস পূর্ব্বক বলিবে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতে ভুল কথা লিখিয়াছেন?*

বাস্তবিক অভ্রান্ত হইলেও, কার্য্যতঃ নহে।

অভ্রান্ত শাস্ত্র স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তাহাতে কি ফল? শাস্ত্র অভ্রান্ত হইলে কি হয়? মানুষতো অভ্রান্ত নয়? শাস্ত্র যে বুঝিবে সেতো অভ্রান্ত নয়? জল নির্ম্মল হইলে কি হয়, পাত্র যে মলিন। মলল পাত্রে, নির্ম্মল জলের নির্ম্মলতা কোথায় থাকে? জগতের পদার্থনিচয় যেরূপ বর্ণবিশিষ্ট কেন হউক না, যাহার চক্ষে ন্যাবা হইয়াছে, সে সকলই হরিদ্রাবর্ণ দেখিবে। বেদ, বাইবেল বা কোরান যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকে কেন, অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস কর না, যখন তুমি নিজে ভ্রান্ত, যখন ভ্রান্ত মনের সাহায্যে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে, তখন শাস্ত্র অভ্রান্ত হইলেও তুমি ভ্রান্তভাবেই উহার অর্থ বুঝিবে। যেমন তোমার মন, সেইরূপ ভাবেই তোমার নিকট শাস্ত্র প্রকাশ পাইবে;—নির্ম্মল জল পঙ্কিলপ্রণালীর মধ্য দিয়া আসিয়া পঙ্কিল হইয়া যাইবে; সুতরাং শাস্ত্র অভ্রান্ত হইলেও তোমার পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অভ্রান্তসত্যলাভ অসম্ভব ব্যাপার। অভ্রান্ত শাস্ত্র মানি না; কিন্তু মানিলেও, সে অভ্রান্ততার কার্য্যে কোন ফল হয় না।

এ কথার যাথার্থ্য পক্ষে অতীতসাক্ষী ইতিহাস শতকণ্ঠে সাক্ষ্যদান করিতেছে। একই কোরানকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য

* পরিশিষ্ট দেখ।

বলিয়া সকল মুসলমান বিশ্বাস করিতেছেন, অথচ সিয়া, সুন্নী প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়;—পরস্পরের মধ্যে মত ও কার্য্যে কত প্রভেদ!

খ্রীষ্টীয়জগৎ বাইবেল গ্রন্থকে একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া শিরোধার্য্য করিতেছেন, অথচ খ্রীষ্টিয়ানগণ, রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট, ভিন্নমতাবলম্বী দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একই বাইবেল গ্রন্থকে তাঁহারা পরমেশ্বরপ্রেরিত অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, অথচ এ উভয়ের মধ্যে মতগত পার্থক্য এত অধিক যে, ইহাঁদিগকে দুই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রতীত হয়।

সমগ্র খৃষ্টীয়জগৎ কেন? শুদ্ধ এক ইংলণ্ড ভূমিতে অন্যূন দুই শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খৃষ্টীয় সম্প্রদায়। ইহাতেই বুঝিতে পাবেন, সমুদায় খৃষ্টীয়জগৎ বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে কিরূপ বিভক্ত। কোন মহাত্মা * বলিয়াছিলেন, খৃষ্টীয়জগৎ পঞ্চাশ-সহস্র সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ("Christendom split into fifty thousand sects") একজন রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টিয়ান ও একজন ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টিয়ান, আপনাদিগকে খৃষ্টিয়ান বলিয়া পরিচয় দিতেছেন; অথচ উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! উভয়েই একই বাইবেল গ্রন্থকে পরমেশ্বরপ্রেরিত আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেও, হিন্দু মুসলমানে যত প্রভেদ, ক্যাথলিক ও (প্রাচীন তন্ত্রের) ইউনিটেরিয়ানের মধ্যে তত প্রভেদ বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।

খৃষ্ট বলিয়াছেন, "যদি তোমার চক্ষু কুদৃষ্টি করে, চক্ষু উৎ-

* স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন।

পাটন করিয়া ফেল; কেননা, তোমার সমুদয় দেহ নরকে পতিত হওয়া অপেক্ষা, একটি অঙ্গ বিনষ্ট হওয়া ভাল।” ব্যভিচার সম্বন্ধে খৃষ্টের এরূপ কঠিন উপদেশ। কিন্তু খৃষ্টীয় সমাজের পুরাবৃত্ত কি বলিতেছে? আদমাইটিজ (Adamites) নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ব্যভিচারকে পাপ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এক বাইবেল, এক খৃষ্ট, এক খৃষ্টিয়ান নাম, অথচ ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানে “আস্‌মান্ জমিন্ তফাৎ।”

এখন বিদেশ হইতে স্বদেশে আসি। হিন্দুসমাজ চিরদিন বেদাদি শাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিতেছেন, অথচ অগণ্য প্রকার মতভেদ! অগণ্য সম্প্রদায়!

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের ‘উপাসক সম্প্রদায়’ গ্রন্থ পাঠ কর, দেখিবে কোটী কোটী লোক, এক হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া এক অপৌরুষেয় শাস্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া, এক আর্য্য পিতৃপুরুষের দোহাই দিয়াও অগণ্যবিধ সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছেন! তাঁহাদের মত ও অনুষ্ঠানের বিরোধ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

পণ্ডিতেরা আপনাদের বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে একই বেদকে বিভিন্ন ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। একই বেদ হইতে সায়ন ও শঙ্কর, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। বহুকাল হইতে ভারতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, অথচ এই উভয় মতাবলম্বীগণ একই শাস্ত্রের দোহাই দিতেছেন!

কেবল উক্ত মত কেন? এক অপৌরুষেয় শাস্ত্র হইতে ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ অশেষ প্রকার বিরোধী ধর্ম্মমত নিঃসরণ করিয়াছেন। অধুনাতন কালে পরলোকগত দয়ানন্দ সরস্বতী

ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার ব্যাখ্যায় হিন্দুর চিরপূজ্য, অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় বেদ হইতে দেব দেবী সকল অন্তর্হিত হইলেন। তিনি বেদের মধ্যে এক নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিলেন না। দয়ানন্দ আপনার অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি প্রভাবে ভারতীয় সমগ্র হিন্দুসমাজের চিরবন্দ্য বেদের সাহায্যে পৌত্তলিকতা খণ্ডন করিয়া, এক অনাদি অনন্ত, অরূপ ব্রহ্মপূজা সংস্থাপন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ দেশের নানা প্রদেশে, তাঁহার বেদব্যাখ্যা ও ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছেন।

শাস্ত্র এক হইলেও, শাস্ত্রাবলম্বীদিগের বুদ্ধিগত পার্থক্য নিবন্ধন উহার বিবিধ বিরোধী ব্যাখ্যা হইতে থাকে; এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। মানুষের বুদ্ধি ও রুচির গতি যেমন অনেক স্থলে সম্পূর্ণ বিপরীত, সেইরূপ, তাঁহাদের শাস্ত্রনিষ্পন্ন মত সকলও সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যতই কেন বিপরীত হউক না, তাঁহারা একই ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত হন, এবং একই মূল শাস্ত্রের দোহাই দেন।

সকল দেশের শাস্ত্রের পক্ষে এ কথা সত্য। কিন্তু আমাদের প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রবিষয়ে ইহা বিশেষরূপে সত্য। সংস্কৃত ভাষাকে যে দিকে ঘুরাও, সেই দিকেই ঘুরে। এমন আর কোন ভাষাই নহে। সুতরাং সংস্কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যার শেষ নাই। যে পণ্ডিতের নিজের মত যাহা, তিনি শাস্ত্র হইতে তাহাই নিষ্পন্ন করেন। একজন শাক্ত, সমগ্র ভাগবত গ্রন্থ শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

একতাল কাদা লইয়া বালকেরা কখন মানুষ গড়ে, কখন বানর গড়ে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করে; পণ্ডিতেরা শাস্ত্র লইয়াও সেইরূপ করিতেছেন। কেহ বা শাস্ত্র হইতে প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, সুরাপান করিলে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নরকগামী হয়। আবার কেহ বা শাস্ত্র দেখাইয়াই বুঝাইয়া দিতেছেন যে, যদি কেহ সুরাপান করিয়া ভূমিতলে পতিত হয়, ও বমন করে, ভগবতী তাহার প্রতি প্রসন্না হন! উভয়েই শাস্ত্রের দোহাই দিতেছেন! যে মাটীতে পূজার ঘট, সেই মাটীতেই মদের গুটি প্রস্তুত হয়।

শাস্ত্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান অসম্ভব।

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়ে যতই কেন মতভেদ থাকুক না, তাহাতে তোমার কি? তুমি কেন নিজে সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার মর্ম্ম গ্রহণ কর না? কেহ কেহ যথার্থই এ কথা বলেন। কিন্তু কে সকল শাস্ত্র পড়িতে পারে? পড়িলেও কে প্রকৃতরূপে উহার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারে? লক্ষ লোকের মধ্যে কয়জন পারে? বড় বড় পণ্ডিতদিগের মধ্যে যেরূপ মতভেদ, তাহাতে কেমন করিয়া বুঝিব যে, আমিই যথার্থরূপে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব? কোন্ সাহসে তাহা মনে করিব? দুই বড় পণ্ডিত, দুই মত; তবে আমি শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে, তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণে সক্ষম হইব, ইহা কেমন করিয়া মনে করিতে পারি? ফল কথা এই, শাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও, অভ্রান্তরূপে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং মতে ও বিশ্বাসে শাস্ত্র অভ্রান্ত হইলেও কার্য্যতঃ সে অভ্রান্ততা কিছুই নহে। তবে পূর্ণ-

জ্ঞান পরমেশ্বর এইরূপ বৃথা নিষ্ফল অভ্রান্ততা বিধান করিয়াছেন বলিয়া কেমন করিয়া স্বীকার করিব?

গ্রন্থে লেখা আছে বলিয়াই, তাহা ঈশ্বরপ্রেরিত হইতে পারে না।

গ্রন্থকার দেবানুপ্রাণিত হইয়া অথবা দেবতার আদেশে গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন বলিলেই যে, সে গ্রন্থকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হইবে, এমন নহে। ভারতচন্দ্র স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশিতা অন্নদাপ্রদত্ত অমৃত পান করিয়া, অন্নদার আদেশে, অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। উহা কবির কল্পনা অথবা কবির স্বপ্নমাত্র বিবেচনা করাই সঙ্গত। তাহা না করিয়া উহা সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিলে, এবং অন্নদামঙ্গল গ্রন্থকে দৈবশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে কি বিবেচনার কার্য্য হয়? ভগবদ্গীতার বক্তা ও শ্রোতা, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন। বর্ষে বর্ষে শ্রীরামপুর পাঞ্জিকা বাহির হইতেছে। উহার বক্তা স্বয়ং মহাদেব, শ্রোতা পার্ব্বতী।

হর প্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী;
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।
কোন্ গ্রহ হইল রাজা কেবা মন্ত্রীবর;
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি দিগম্বর।
ভব কন ভবানীকে কহি বিবরণ;
বৎসরের ফলাফল করহ শ্রবণ।

তবে কি শ্রীরামপুরের পঞ্জিকা অমানুষ গ্রন্থ?

আত্মা ও জগৎ ঈশ্বরপ্রণীত শাস্ত্র।

তবে কি শাস্ত্র নাই? শাস্ত্র ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না। প্রকৃত শাস্ত্র আত্মা ও বহির্জগৎ। আত্মা মূলশাস্ত্র :—"আদিগ্রন্থ।" মূল শাস্ত্রের আলোকে বহির্জগৎরূপ শাস্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিতে পারি; নতুবা পারি না। "যা নাই ভাণ্ডে, তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" অর্থাৎ বাহিরে যাহাই কেন থাকুক না, আত্মার আলোকে না দেখিলে উহা থাকা না থাকা সমান। ভিতরের আলোক ব্যতীত বহির্জগৎ অন্ধকার।

নাস্তিক ভিন্ন সকলেই বলিবে যে এই দুই শাস্ত্র, আত্মা ও বহির্জগৎ, পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র। হিন্দু হও, মুসলমান হও, খৃষ্টিয়ান হও, ঐ ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরম শাস্ত্র, সকলেরই স্বীকার্য্য। তার পর মনুষ্যরচিত শাস্ত্র। বেদ,বাইবেল, কোরান প্রভৃতি সকলই শাস্ত্র।

পরমেশ্বর কি অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ দিতে পারেন না?

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, যিনি ব্রহ্মাণ্ডরূপ একটী অভ্রান্ত শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে বেদ বা বাইবেলরূপ আর একটী অভ্রান্ত শাস্ত্র মানবের মঙ্গলের জন্য প্রেরণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আশ্চর্য্য কিছুই নহে। কিন্তু অভ্রান্ত গ্রন্থ প্রেরণের উদ্দেশ্য কি? মানুষ নিজের জ্ঞানবলে, ব্রহ্মাণ্ড-রূপ শাস্ত্রের সাহায্যে সত্যনির্দ্ধারণে অক্ষম বলিয়াই ত তিনি অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ প্রেরণ করিলেন? কিন্তু সে অভ্রান্তগ্রন্থ মনুষ্যকে প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান দিতে সক্ষম হইল কই? ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাইয়াও মানুষ সহস্র বিভিন্ন পথে ছুটিতেছে কেন? ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, ইহা কেমন করিয়া বলিব?

কিরূপে শাস্ত্র হইতে সত্য লাভ হয়?

পরমেশ্বর সাধকের আত্মায় স্বয়ং প্রকাশিত হন। তাঁহার আলোকে আত্মা আলোকিত হয়। সেই আলোকে শাস্ত্রের সত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভিতরে সেই স্বর্গীয় প্রদীপ না জ্বলিলে, যে শাস্ত্রে যাহাই কেন থাকুক না, মনুষ্যের পক্ষে সকলই বৃথা। সেই জ্ঞানপ্রদীপ হস্তে লইয়া শাস্ত্ররূপ জঙ্গলে প্রবেশ কর, অন্বেষণ কর, অনেক অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। কিন্তু ইহাও বলি যে, সে জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ স্থান নহে। দেখিও যেন ভীষণ কুসংস্কারের গ্রাসে পড়িয়া নষ্ট না হও।

আসল শাস্ত্র কি?

এক কথায় বলি, "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্"! সত্যই আমাদের একমাত্র অবিনশ্বর শাস্ত্র। স্বদেশে বিদেশে, যেখানে সত্য পাইব; বেদ, কোরান, বাইবেল, যেখানে সত্য পাইব, আদর করিয়া, যত্ন করিয়া, তাহা মস্তকে ধারণ করিব। কেবল বেদ, কোরান, বাইবেল কেন? সাহিত্য, বিজ্ঞান কি শাস্ত্র নহে? হাফেজ, সেক্সপিয়ার, এমার্সন, কার্লাইলের গ্রন্থ কি শাস্ত্র নহে? নিউটনের প্রিন্সিপিয়া কি শাস্ত্র নহে? সত্য মাত্রই পরমেশ্বরের সত্য। যে কোন গ্রন্থ সত্য শিক্ষা দেয়, তাহাই শাস্ত্র।

মনুষ্যরচিত শাস্ত্র সকল আসল শাস্ত্রের অর্থ প্রকাশ করে। বেদ, বাইবেল, কোরান, আত্মারূপ আদি শাস্ত্রের টীকা। সকল দর্শন, সকল বিজ্ঞান, ব্রহ্মাণ্ডবেদের ভাষ্যমাত্র। ভাষ্যকারদিগের অনেক ভ্রম হইয়াছে;—হওয়াই সম্ভব।

কোন একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থে আমাদের শাস্ত্র বদ্ধ নহে! “অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস্, যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোম্ত যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র; কঠ ও তলবকার, মুষা ও মহম্মদ, এবং যিশু ও চৈতন্য, পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইবে, এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর অনির্ব্বচনীয় রূপ উৎপন্ন হইবে।” (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৭৭ শক; বৈশাখ)

“এক এক অসীম প্রায় সৌরজগৎ যে বিশ্বরূপ মূলগ্রন্থের এক এক পত্রস্বরূপ; সূর্য্য,চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষরস্বরূপ, এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী মসিদ্বারা লিখিতবৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল্প অভ্রান্ত শাস্ত্র। যে দেশের যে কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাঢ় মূলগ্রন্থ শুদ্ধরূপে পাঠ ও তাহার যথার্থ অর্থ প্রতীতি করিতে পারেন, তিনিই স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অন্য লোকের ভ্রান্তিদূর করিতে সমর্থ হয়েন। প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জনের আর অন্য উপায় নাই; যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই। নানা দেশীয় পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারেরা যদি এই মূলগ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিতেন, এবং যে পর্য্যন্ত অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার সহিত মনঃকল্পিত ব্যাপার সমুদয় মিশ্রিত করিয়া না লিখিতেন, তবে

ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম এতদিনে অতি প্রাচীন ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইত।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৩ শক, ফাল্গুন)

মনুষ্যরচিত সকল শাস্ত্রই আসল শাস্ত্রের ভাষ্য। আত্মারূপ ভিত্তির উপরে সমুদয় শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। যেমন মানবাত্মা হইতেই সকল শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ মানবাত্মার আলোকেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। যেমন বধিরের নিকট সঙ্গীত, অন্ধের নিকট রূপ, সেইরূপ অধ্যাত্ম-আলোকবিহীন ব্যক্তির নিকটে শাস্ত্র। আমাদের প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে স্পষ্টই রহিয়াছে যে,অন্তর্জগতেই ধর্ম্মশাস্ত্র।

"ত্রয়োবেদা এতএব। বাগে বার্গ বেদো, মনোযজুর্ব্বেদঃ, প্রাণঃসামবেদঃ।"

তিন বেদ ইঁহাই। বাণীই ঋগ্বেদ, মন যজুর্ব্বেদ, প্রাণ সামবেদ।

মানবাত্মাতেই যে সত্যালোক লাভ করা যায়, বাইবেল গ্রন্থে তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মহাত্মা সেণ্টপল বলিতেছেন যে, য়িহুদি ভিন্ন অন্যান্য জাতীয় লোকে শাস্ত্রবিহীন হইয়াও তাহাদের হৃদয়লিখিত শাস্ত্রানুসারে চলিয়া থাকে। *

---

* For when the Gentiles which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law, are a law unto themselves.

Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and *their* thoughts the mean while accusing or else excusing one another. Romans ii. 14 15.

হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষত্ব।

মনুষ্যরচিত শাস্ত্রসকলকে অভ্রান্ত বলি না, অথচ সকল শাস্ত্রকেই,—কোরান, জেন্দাবেস্তা, বাইবেল, বেদ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রকেই সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। কেননা সকল শাস্ত্রেই পরমার্থ তত্ত্ব শিক্ষাদান করে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রনিচয়কে বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি।

এরূপ বিশেষত্ব কেন? কেহ কেহ ইঁহাকে দুর্ব্বলতা বা সংকীর্ণতা বলিতে পারেন। কিন্তু আমি তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যাঁহারা উদার, সর্ব্বজনীন ভাবের পক্ষপাতী হইয়া শাস্ত্র বিশেষের প্রতি বিশেষ সম্মানের বিরোধী, আমি তাঁহাদের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত।

হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি এই অনুরাগ ও সম্মান কেন? প্রথমতঃ উহা আমাদের পিতৃপুরুষদিগের হৃদয়সাগরোত্থিত অমৃত। দুই খানি গ্রন্থ যদি সমান ভাল হয়, তাহা হইলেও তন্মধ্যে যদি এক খানি তোমার ভক্তিভাজন পিতৃদেবের রচিত হয়, তাহা কি তুমি একটু বিশেষ অনুরাগদৃষ্টিতে দেখিবে না? যাঁহাদের পবিত্র শোণিত এখনই এই দেহাভ্যন্তরস্থ ধমনীপুঞ্জের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি,—এই ঘোরতর অবনতির মধ্যে বাস করিয়াও যাঁহাদের বংশজাত বলিয়া মনুষ্যোচিত আত্মমর্য্যাদা একবারে বিসর্জ্জন দিতে পারি না, এই তমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনেও যাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি সুসভ্যজগতের সম্মুখে ভারতের গৌরব রক্ষা করিতেছে, সেই পূজ্যপাদ আর্য্য মহর্ষিগণের গ্রন্থ নিচয়কে বিশেষ অনুরাগনয়নে দেখি কেন, তাহা কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? বলুন দেখি, যখন শ্রবণ করেন যে,

কোথায় জর্ম্মনি, কোথায় ইংলণ্ড, কোথায় আমেরিকা, সকল সভ্যজগতে ভারতের বেদ বেদান্ত, ভারতের ষড়্দর্শন, ভারতের কাব্যনাটক সমাদৃত হইতেছে, তখন কি হৃদয়ের গভীর প্রদেশে একটু অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয় না? বহুকালব্যাপী দুর্গতি ভোগ করিয়াও, সাত শত বৎসর বিদেশীয় জাতির পাদুকা বহন করিয়াও, এখনও যাঁহাদের মহত্বনিবন্ধন আমরা সভ্যজাতির খবরে আসিতেছি, সেই পিতৃপুরুষগণের গভীরজ্ঞানসমুত্থিত শাস্ত্র সকলকে বিশেষ অনুরাগনয়নে দেখিব, ইহা কি আবার বলিবার কথা?

দ্বিতীয়তঃ পরমেশ্বরের স্বরূপ ও সন্নিকর্ষ-বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে যেমন সুগভীর উপদেশ প্রাপ্ত হই, এমন আর কোথাও নহে। মহর্ষিগণের উপাস্য ব্রহ্ম, স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ নামে কোন স্থানবিশেষে বদ্ধ নহেন।

"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরোস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবাদ্য স উশ্ব।"

তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনি অদ্যও যেমন, কল্যও তেমন।

কিন্তু উহাও দূরের কথা। মহর্ষিগণ তাঁহাকে আত্মার অভ্যন্তরে দর্শন করিয়া কেমন অগ্নিময়বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন;—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং"

আত্মারূপ হিরণ্ময় কোষে নিরুপাধি ব্রহ্ম বাস করিতেছেন।

"তমাত্মস্থং যেন পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতী নেতরেষাং।

যে ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আত্মার অভ্যন্তরে দর্শন করেন, তাঁহারই নিত্য সুখ হয়, অপরের হয় না।

প্রাচীন মহর্ষিগণ পরমাত্মাকে "করতলন্যস্তআমলক" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমলক ফল হস্তে থাকিলে যেমন তাহা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়, আত্মার অভ্যন্তরে ব্রহ্মের সত্তা, তাঁহারা সেইরূপ সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া অন্যকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। পরমাত্মার সন্নিকর্ষ বিষয়ক উপদেশের প্রাচুর্য্য ও গভীরতা যেমন প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাই, এমন আর কোথাও নহে।

তৃতীয়তঃ হিন্দুশাস্ত্রের একটি বিশেষ গৌরব এই যে, হিন্দুশাস্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্র অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

"মনো বৈ সমুদ্রঃ মনসো বৈ সমুদ্রাৎ
বাচাঽভ্র্যা দেবাস্ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন্

(শতপথ ব্রাহ্মণে ৭।৫।২।৫২)

মন সমুদ্র ; মন সমুদ্র হইতে বাক্যরূপ কোদালিদ্বারা দেবতারা ত্রয়ীবিদ্যা (বেদ) খুঁড়িয়াছিলেন।

"বিজ্ঞেয়োঽক্ষরঃ সন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলং
"বিহায় শব্দশাস্ত্রাণি যৎসত্যং তদুপাস্ততাম্" (উত্তর গীতা)

সন্মাত্র অক্ষর ব্রহ্মই বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য, জীবনও চঞ্চল ; সকল শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহা সত্য তাহাই অবলম্বন কর।

যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনম্।
এবং তৎপরমং জ্ঞাত্বা বেদেনাস্তি প্রয়োজনম্॥ (উত্তর গীতা)

যে অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছে তার জলে কি প্রয়োজন ;

এইরূপ সেই পরম বস্তুকে জানিলে বেদে প্রয়োজন নাই।

আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধাজ্ঞানং প্রচক্ষতে।

শব্দ ব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্মবিবেকজম্॥ (কুলার্ণব তন্ত্র।)

জ্ঞান দুই প্রকার। শাস্ত্র জন্য এবং বিবেক জন্য। শাস্ত্র জন্য জ্ঞানকে শব্দব্রহ্ম বলে, এবং বিবেক জন্য জ্ঞানকে পরব্রহ্ম বলে।

যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্।

তত্ত্বজ্ঞস্য মহেশানি ন শাস্ত্রেন প্রয়োজনম্॥ (কুলার্ণব তন্ত্র।)

যে ব্যক্তি অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে, তাহার যেমন অন্য আহারে প্রয়োজন নাই, হে মহেশানি, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞের শাস্ত্রে প্রয়োজন নাই।

ন বেদং বেদমিত্যাহুর্বেদ ব্রহ্মসনাতনম্

শব্দবেদকে জ্ঞানীরা বেদ বলেন না, যাহা নিত্য বেদ তাহাই যথার্থ বেদ।

মহাভারতকার এত দূর উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রুতিকে অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেও নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন নাই।

শ্রুতির্ধর্ম্ম ইতি হ্যেকে নেত্যাহুর পরে জনাঃ।

ন চ তৎ প্রত্যসূয়ামো নহি সর্ব্বং বিধীয়তে॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্মে ১০৯অং ১৪শ শ্লোক, ভীষ্ম বচন)

শ্রুতিকে কেহ ধর্ম্ম বলেন, কেহ বলেন না। আমরা তাহার নিন্দা করি না; কিন্তু ইহাও স্বীকার করি না যে, সকল শ্রুতিই ধর্ম্মবিহিত।

আসল জিনিস খুঁজিয়া লও।

সকলের উপরে জ্ঞান। জ্ঞানের দ্বারাই সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্রের বিচার। শাস্ত্রকার যদি নিজে বলেন যে, তিনি পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া অথবা পরমেশ্বরের আদেশে শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, সে কথা তিনি বলিতে পারেন, কিন্তু বলিলেই কেহ বিশ্বাস করিতে বাধ্য নহে। তাঁহার প্রত্যেক কথা অন্তরের আলোকে দেখিতে হইবে, সত্য কি না। ভগবদ্গীতা অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ বক্তা, অর্জ্জুন শ্রোতা বলিয়াই উহা এত আদরের বস্তু, এরূপ নহে। অন্য কোন সামান্য লোক বক্তা ও শ্রোতা বলিয়া বর্ণিত হইলেও উহা পরম সমাদরযোগ্য গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইত, অথবা হওয়া উচিত হইত। কাহার নাম লইয়া গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে ;—স্বয়ং ভগবান্ বা ভগবানের অবতার অথবা ভগবানের অনুগৃহীত বলিয়া কোন ব্যক্তি,—তাহা দেখিবার কিছু-মাত্র প্রয়োজন নাই। গ্রন্থে আসল জিনিস আছে কি না, তাহাই দেখ ;—যথার্থ ধর্ম্ম, যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে কি না, তাহাই দেখ; চাপ্‌রাস্ দেখিয়া ভুলিও না। বেদ বেদান্তে যদি ভ্রম থাকে, তাহাও পরিত্যজ্য, এবং বিদ্যাসুন্দর বা দাসরথি রায়ের পাঁচালিপুস্তকেও যদি সার কথা থাকে, তাহা আদরের সহিত গ্রহণ কর।

আত্মা ও জগৎ পরমেশ্বরপ্রণীত একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র—ইহ-কাল পরকাল অনন্তকালের শাস্ত্র। মৃত্যুর সঙ্গে আর সব শাস্ত্র চলিয়া যাইবে, কিন্তু আত্মারূপ মূলশাস্ত্র জীবনে, মরণে, ইহকাল, পরকালে, চিরদিন জীবের সঙ্গে সঙ্গে। উহা আমাদের আদিগ্রন্থ, "গ্রন্থসাহেব", আমাদের অনন্ত জীবনের পাঠ্যগ্রন্থ। আর সব

এখানকার শাস্ত্র, এখানকার গ্রন্থ এখানেই পড়িয়া থাকিবে, এই আদিশাস্ত্রই সঙ্গে যাইবে; আর মাষ্টারমহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন। আমরা প্রত্যেকে অনন্তকালের জন্ত ভগবানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনিই আমাদের একমাত্র গুরু, শিক্ষক। তাঁহারই চরণতলে বসিয়া চিরদিন জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা শিক্ষা করিব। শাস্ত্রকার নিজের শাস্ত্র নিজে শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

পরিশিষ্ট। (১)

"বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন;—

"এখানে 'মুনিগণের মত ভিন্ন ভিন্ন' অর্থে নগেন্দ্র বাবু মুনিদিগের মতের পরস্পর বিরোধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই যদি শ্লোকরচয়িতার উদ্দেশ্য হইত, তবে সেই পরস্পরবিরুদ্ধ মতকেই তিনি আবার পন্থা বলিতেন না। (১) নগেন্দ্র বাবুর ব্যাখ্যাই যদি সঙ্গত হয়, তবে উক্ত শ্লোকের উপরের তিন চরণের সহিত "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই শেষ চরণের ঐক্য থাকে না। আমাদের বিবেচনায় ঐ শ্লোকের অর্থ এইরূপ— বেদ, স্মৃতি এবং মুনিদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ নানা রকম, এক রকম নহে। চিন্তাশীলতার ফল বিরুদ্ধমত নহে, (২)

---

(১) নানা প্রকার বিভিন্ন পন্থা কি হইতে পারে না?

(২) কেন; চিন্তাশীলেরা কি অভ্রান্ত?

বিবিধ মত, বিরুদ্ধমতই যদি চিন্তাশীলতার লক্ষণ হয়, তবে কি বিবাদ বিসম্বাদ চিন্তাশীলতার ফল? (৩) মুনিগণ কেহ ভক্ত, কেহ যোগী, কেহ শক্তির উপাসক, কেহ কর্ম্মী, এইরূপ বিবিধ প্রকারের মুনি আছেন, সুতরাং নানা প্রকারের মতও আছে। ইহাতে এ মত ভাল,ও মত মন্দ ইহা প্রকাশ পায় না। (৪) সকল মুনিই অভ্রান্ত এবং সকল মতই সত্য। (৫) সুতরাং মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, তাহাই যাইবার পথ। যাহা সত্য, তাহা কি আর বিবিধ প্রকার হয় না? যেমন গোলাপ, জবা, বেল, চাঁপা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ফুল আছে, সে সকল গুলিকেই ফুল বলে। সেইরূপ মুনিদিগের মতও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকলগুলিই সত্য। শ্লোক-রচয়িতার ভাব এই।"

কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় উক্ত আপত্তির যে উত্তর দিয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম ;—

"হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে যে অনেক পরস্পরবিরুদ্ধ মত আছে ইহা শাস্ত্রজ্ঞদিগের নিকট অবিদিত নহে। ইহার কারণ কেবল এই যে শাস্ত্র স্বাধীনচিত্ত নানা মুনিদিগের উক্তি। এ বিষয়ের যদি প্রমাণসংগ্রহ করা যায়, তবে তদ্দ্বারা এক খণ্ড বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। হিন্দুরা যে অবধি স্বাধীনচিত্ততা এবং বিবেকের অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে শাস্ত্র-চক্ষু-মাত্র হইয়াছেন, সে অবধি তাঁহারা শাস্ত্রের স্পষ্ট পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য সকলের সামঞ্জস্য স্থাপনে যত্নান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু

---

(৩) সকল বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদ হয় না, কোন কোন বিষয়েই হয়।

(৪) মুনিরা স্বয়ং বলিয়াছেন, এ মত ভাল ও মত মন্দ।

(৫) একথা শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

ইহার ফল এই হইল যে, বিরোধের পরিহার না হইয়া পরস্পর-বিরুদ্ধ মতাবলম্বী নানা হিন্দুসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। শঙ্করাচার্য্য বেদ ও বেদান্তের পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যরাশির এক প্রকার সমন্বয় করিয়াছেন, রামানুজ অন্য প্রকার, মাধবাচার্য্য অন্য প্রকার; সায়নাচার্য্য ও মহীধরের সহিত দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদব্যাখ্যার এত প্রভেদ যে, তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ অন্য কোন ব্যাখ্যায় দেখা যায় না। এ সকল প্রভেদের বিশেষ কারণ স্ব স্ব মত বা সম্প্রদায়ের পক্ষপাত মাত্র। আমাদিগের হিন্দু ভ্রাতারা যদি এ প্রকার পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া সত্যকেই অবিনশ্বর শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করেন, তবে শাস্ত্রের মান, বা অভিমান রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মিথ্যা বা কল্পনার শরণ গ্রহণ করিতে হয় না।

"ত্রৈলোক্য বাবু শাস্ত্রবাক্যের পরস্পরবিরোধ স্বীকার করেন না; যদিও শাস্ত্র তাহা স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন এবং শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তও রহিয়াছে; তন্মধ্যে কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রুতির বা বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধ।

"জিত্বাশৈলিনির্বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি"

(বৃহদারণ্যকে ৪।১।২)

অর্থ। শিলিনের পুত্র জিত্বা (নামক ঋষি) বাক্যকে ব্রহ্ম (মানেন)

"উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ প্রাণোবৈ ব্রহ্মেতি" (ঐ৪।১।৩)

অর্থ। শুল্বের পুত্র উদঙ্ক প্রাণকে ব্রহ্ম (মানেন)

"বর্কুর্বার্ষ্ণিশ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি" (ঐ ৪।১।১)

অর্থ। বৃদ্ধের পুত্র বব্রু চক্ষুকে ব্রহ্ম (মানেন)

"গর্দ্দভীবিপীতো ভারদ্বাজঃ শ্রোত্রংবৈ ব্রহ্মেতি"

(ঐ ৪।১।৫)

অর্থ। গর্দ্দভীবিপীত ভরদ্বাজ ঋষি শ্রোত্রকে ব্রহ্ম (মানেন)

"সত্যকামো জাবালো মনোবৈ ব্রহ্মেতি" (ঐ ৪।১।৬)

অর্থ। জবালার পুত্র সত্যকাম মনকে ব্রহ্ম (মানেন)

"বিদগ্ধঃ শাকল্যো হৃদয়ংবৈ ব্রহ্মেতি" (ঐ ৪।১।৭)

অর্থ। শাকল্যবংশীয় বিদগ্ধ হৃদয়কে ব্রহ্ম (মানেন)

উক্ত কয়েক শ্রুতিতে বেদ স্বয়ং বেদবাক্যের এবং ঋষিদিগের মতের পরস্পর বিরোধ দেখাইতেছেন।

স্মৃতিতে যে পরস্পর অনেক বিরোধ আছে, তাহার প্রমাণ দেখান অনাবশ্যক, যেহেতু সকল স্মৃতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহা জানেন। তদ্বিষয়ে দু একটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। মনু মদ্য মাংসাদি সেবনে মহাপাপ বর্ণন করিয়া আবার স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"ন দোষো বিদ্যতে মদ্যেন,
মাংসে ন চ মৈথুনে প্রবৃত্তি-
রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"

অর্থ। মদ্য মাংস ও মৈথুনে দোষ নাই যেহেতু ইহাতে জীবদিগের প্রবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তিতে অনেক ফল।

মনু একস্থলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শূদ্রার সহিত বিবাহের বিধান দিয়াছেন, অন্য স্থলে তাহার নিষেধ করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ বিষয়ে যে, শাস্ত্রের মতভেদ আছে, তাহা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। অধিক কি, শাস্ত্রের পরস্পরবিরোধ, ব্যাস ঋষি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, যথা—

"শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥"

অর্থ। বেদ, স্মৃতি এবং পুরাণের যেখানে (পরস্পর) বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেখানে বেদের বাক্য প্রমাণ; স্মৃতি এবং পুরাণের বিরোধ (দৃষ্ট হইলে) স্মৃতিকে শ্রেষ্ঠ (মানিতে হইবে)। যদি শাস্ত্রে পরস্পরবিরুদ্ধমত না থাকিত, তবে ব্যাস এরূপ বলিবেন কেন?"

পরিশিষ্ট। (২)

বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে, কেবল এরূপ নহে। এক শাস্ত্র অন্য শাস্ত্রের বিরোধী। তন্ত্র ও কোন কোন পুরাণের মধ্যে এই প্রকার বিরোধ দৃষ্ট হয়। তন্ত্র শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে বলা হইতেছে যে, কলিযুগে তন্ত্রই একমাত্র শাস্ত্র।

কৃতে শ্রুত্যাদিতোমার্গস্ত্রেতায়াং স্মৃতিচোদিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগম সম্ভবঃ॥
ইত্যাগমবচনম্॥

সত্যযুগে বেদোক্ত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত ধর্ম্ম, কলিযুগে আগমোক্ত ধর্ম্ম।

কিন্তু পুরাণে সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, "আগমশাস্ত্র মোহশাস্ত্র, লোকমোহনের নিমিত্ত শিব ও বিষ্ণু, আগমশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা,

চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবঃ সশিবস্তথা।
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥

নাগোজীভট্টকৃত সপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত কূর্ম্ম পুরাণ।

বিষ্ণু ও শিব কাপাল নাকুল বাম পূর্ব্বভৈরব পশ্চিম ভৈরব পাঞ্চরাত্র পাশুপত প্রভৃতি সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র করিয়াছেন।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।
প্রথমংহি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্॥

নাগোজীভট্টকৃত সপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ।

দেবি, শ্রবণ কর যথাক্রমে মোহশাস্ত্র সকল বলিব। যে মোহশাস্ত্রের শ্রবণমাত্রে জ্ঞানীরাও পতিত হন। শৈব পাশুপত প্রভৃতি মোহশাস্ত্র আমিই প্রথমতঃ কহিয়াছি।

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তেষাং নিষ্ঠা তু তামসী।
করালভৈরবং চাপি যামলং বামমেবচ।
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥

মলমাসতত্ত্বধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

এইলোকে বেদবিরুদ্ধ ও স্মৃতিবিরুদ্ধ যে নানাবিধ শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদায়ের তামসীগতি অর্থাৎ তদনুসারে চলিলে অন্তে অধোগতি হয়। করাল ভৈরব যামল বাম ও এইরূপ অন্যান্য মোহশাস্ত্র সকল ভবার্ণবে লোকমোহনের নিমিত্ত

আমি সৃষ্টি করিয়াছি। এইরূপে আগমশাস্ত্রকে শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ মোহশাস্ত্র স্থির করিয়া অধিকারিভেদে কোন কোন অংশ গ্রাহ্য করিয়াছেন। যথা—

তথাপি যোহংশো মার্গাণাং বেদেন ন বিরুধ্যতে।
সোহংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তঃ কেষাঞ্চিদধিকারিণাম॥

নাগোজীভট্টকৃত সপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত সূতসংহিতা।

তথাপি অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ হইলেও আগমোক্ত পথের যে অংশ বেদবিরুদ্ধ না হয়, কোন কোন অধিকারীর পক্ষে সেই অংশ প্রমাণ।

আগম শাস্ত্রের অধিকারী কে, তাহাও নিরূপিত হইয়াছে। যথা—

শ্রুতিভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্ত পরাঙ্মুখঃ।
ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ॥
পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং মন্ত্রংবৈখানসাভিধম্।
বেদভ্রষ্টান্ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্॥

নাগোজীভট্টকৃত সপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত শাম্বপুরাণ।

বেদভ্রষ্ট এবং স্মৃতিপ্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণ ক্রমে বেদসিদ্ধির নিমিত্তে তন্ত্রশাস্ত্র আশ্রয় করিবেক। বিষ্ণু বেদভ্রষ্টদিগের নিমিত্তে পাঞ্চরাত্র ভাগবত বৈখানসমন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র করিয়াছেন। এইরূপ মোহশাস্ত্র সৃষ্টি করিবার তাৎপর্য্যও পদ্মপুরাণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।

নাগোজীভট্টকৃত সপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত।

বিষ্ণু শিবকে কহিতেছেন ;—

তোমার কল্পিত আগমশাস্ত্রসমূহদ্বারা লোককে আমাতে বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর। তাহা হইলে এই সৃষ্টি-প্রবাহ উত্তরোত্তর চলিবেক।"*

আত্মার স্বাধীনতা।

আত্মার স্বাধীনতা কি? মানবাত্মার নিজের শক্তি আছে। মনুষ্য আত্মশক্তিদ্বারা আপনাকে অন্ততঃ আংশিকরূপে পরিচালিত করিতে পারে। মনুষ্য অন্য কোন শক্তির সম্পূর্ণ অধীন নহে; অর্থাৎ মনুষ্য অন্য শক্তির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে না; মনুষ্যের স্বতন্ত্র শক্তি আছে। মনুষ্যের প্রবৃত্তি সকল মনুষ্যকে সম্পূর্ণ পরিচালিত করে না। মানবাত্মা আত্মশক্তিদ্বারা প্রবৃত্তিসকলকে পরিচালিত করে; প্রবৃত্তি-প্রবাহকে প্রবলীকৃত, মন্দীভূত, বিভিন্ন পথে প্রধাবিত বা একেবারে নিরুদ্ধ করিতে পারে। ইহারই নাম আত্মার স্বাধীনতা।

অনেকে আত্মার স্বাধীনতা স্বীকার করেন না। স্বাধীনতা বিষয়ক মতের বিরুদ্ধে তাঁহারা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে প্রথমে কয়েকটী প্রধান যুক্তির সমালোচনা করিয়া তৎপরে অখণ্ডনীয় যুক্তিপরম্পরা অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মার স্বাধীনতা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

---

* সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ক বিচারপুস্তকের ২য় ভাগের ১১৯—১২১ পৃষ্ঠা দেখ।

কার্য্যকারণসম্বন্ধ ও স্বাধীনতা।

অশিক্ষিত লোকে এই পরিদৃশ্যমান্ বহির্জগতের অনেক ঘটনা অসম্বদ্ধ ও বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে করে। কিন্তু বিজ্ঞান নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এ জগতের প্রতি অংশের সহিত প্রতি অংশের সম্বন্ধ। ইহার অন্তর্গত ঘটনা-নিচয় অখণ্ডনীয় কার্য্যকারণসম্বন্ধে নিবদ্ধ। অখণ্ডনীয় নিয়মে সমুদ্রের জলে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে উহা হইতে বাষ্প উৎপন্ন হয়, বাষ্প আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়, শীতল বায়ুর সংস্পর্শে সেই মেঘ আবার জল হয়, এবং মাধ্যাকর্ষণগুণে পৃথিবীতলে পতিত হয়। ইহারই নাম বৃষ্টি। অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে চিরদিন সংসারে বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছে। কখন উহার অন্যথা হয় না। এই পরিদৃশ্যমান্ সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অংশ কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ। কুত্রাপি ইহার ব্যভিচার লক্ষিত হয় না। শর্ষপকণা তুল্য একটী বীজ-কণিকা হইতে কেমন আশ্চর্য্য নিয়মে প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ উৎপন্ন হয়! বীজ মৃত্তিকানিহিত হইল, উহা উপযুক্ত-রূপে উত্তাপ ও জল প্রাপ্ত হইল, ক্রমে উহা অঙ্কুরিত হইল, ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে উহা পত্রফলে সুশোভিত জটাজুট-ধারী আশ্চর্য্য বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া আপনার তলদেশে সহস্র লোককে আশ্রয় দান করিল। একটী অবস্থার পর আর একটী অবস্থা, সেটীর পর আর একটী অবস্থা, এইরূপ চির-নির্দ্দিষ্ট নিয়মমার্গ অনুসরণ করিয়া প্রকৃতিরাজ্যের ঘটনানিচয় চিরদিন চলিতেছে।

সমুদ্র, পর্ব্বত, প্রান্তর, মরুভূমি, লোকালয়, বিজনগহন,

জলস্থল সর্ব্বত্র চিরনির্দ্দিষ্ট অখণ্ডনীয় নিয়ম। কোথাও বিশৃঙ্খলা নাই। যে ঘটনাটীকে আপাততঃ নিয়ম-বহির্ভূত আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে হয়, তাহাও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের ফল। নিম্নে পৃথিবীতলে ঘটনানিচয় যেমন নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ; ঊর্দ্ধে অসীম গগণে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও সেইরূপ নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ। গ্রহ, উপগ্রহ আকাশপথে অচিন্তনীয় দ্রুতবেগে ছুটিতেছে; কিন্তু সাধ্য কি যে, চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মের লেশমাত্র অতিক্রম করে। বলিয়াছি যে, যে ঘটনাটিকে আপাততঃ নিয়মবহির্ভূত আকস্মিক ঘটনা (chance) বলিয়া মনে হয়, উঁহাও অখণ্ডনীয় নিয়মেরই ফল। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, যেমন নিয়মে চলে, হঠাৎ প্রকাশিত ধূমকেতুও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মমার্গেরই অনুসরণ করিতেছে। আপাততঃ কোন ঘটনা বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে করিতে পার, কিন্তু বিজ্ঞানের আলোকে দেখ যে, যে অনন্ত শৃঙ্খলে জগৎবদ্ধ, উহা তাহারই অন্তর্গত। উহা ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রকাণ্ড কলের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। গাজীর কুড়ুলের ন্যায় উহা আপাততঃ আলগা বলিয়া বোধ হইলেও, বাস্তবিক উহা বিশ্ব-শৃঙ্খলায় অখণ্ডনীয়-রূপে বদ্ধ। "গাজির কুড়ুল নড়ে চড়ে খসে না।"

বহির্জ্জগতে যেমন, অন্তর্জ্জগতেও সেইরূপ। সকল ঘটনাই নিয়মানুগত, কার্য্যকারণশৃঙ্খলবদ্ধ। অন্তর্জগতের ঘটনা আপাত-দৃষ্টিতে অধিকতর বিশৃঙ্খল বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু মনো-বিজ্ঞান প্রত্যেক মানসিক ঘটনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রদর্শন করেন যে, উহা কার্য্যকারণশৃঙ্খলের অতীত নহে। ভাবসঙ্গ (Association of Ideas) মনোজগতের একটী প্রধান নিয়ম। একটী পদার্থ বা ঘটনা দেখিলে অপর একটী পদার্থ বা

ঘটনা স্মরণ হয়। বিপদের সময় সম্পদ স্মরণ হয়, গ্রন্থ দেখিয়া গ্রন্থকারকে স্মরণ হয়, একটী বাড়ী স্মরণ হইলে তাহার পার্শ্বের বাড়ী স্মরণ হয়, পুত্রকে দেখিলে পিতাকে স্মরণ হয়, এইরূপ অসংখ্য স্থলে ভাবসঙ্গের নিয়মানুসারে কার্য্য হইতেছে।

একটী কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। উহার কারণ কি? ইচ্ছা (will), ইচ্ছার কারণ কি? অভিসন্ধি (motive), অভিসন্ধির কারণ কি? চরিত্র (disposition), চরিত্রের কারণ কি? পিতৃ-মাতৃচরিত্র এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অবস্থা। এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা এইরূপে তর্ক করিয়া প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন যে, জড়-জগতের ন্যায় মানুষও কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-বদ্ধ। বাস্তবিক তাঁহা-দের মতে মানুষ জ্ঞান, ভাব, বাসনা ও ইচ্ছা-সমন্বিত কল মাত্র। তাঁহারা মানুষের ভিতরে সকলই কার্য্যকারণময় দেখেন; সুতরাং স্বাধীনতার স্থান দেখিতে পান না। *

---

* ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার,—প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যে স্বাধীনতা, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। যাঁহারা আত্মার স্বাধীনতা অস্বীকার করেন, তাঁহারা কখন এমন কথা বলেন না যে, মানুষের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার স্বাধীনতা নাই। ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার এবং কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে সাধ্যমত তাহা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা যে, মানুষের আছে, ইহা কোন শ্রেণীর দার্শনিকই অস্বীকার করেন না।

তবে যাঁহারা আত্মার স্বাধীনতা অস্বীকার করেন, তাঁহারা কি বলেন? তাঁহারা বলেন যে, মানুষ যাহাই কেন করুক না, তাহার প্রত্যেক চিন্তা, ভাব, বাসনা ও ইচ্ছা, অচ্ছেদ্য কার্য্য-কারণ-সূত্রে বদ্ধ। প্রত্যেক মানসিক অবস্থার কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী মানসিক অবস্থা। প্রত্যেক মানসিক অবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার কার্য্য। কার্য্য অবশ্য কারণের অধীন। সুতরাং প্রত্যেক মানসিক অবস্থা শৃঙ্খল-বদ্ধ।

কি জড়জগতে, কি মনোজগতে, উভয় জগতেই, একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা, চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সংঘটিত হইতেছে।

"বিংশতিটী গোলা একটী একটী করিয়া সরল রেখায় রাখিয়া দাও, প্রথমটী আঘাত কর, যদি পার্শ্বে সরিয়া যাইবার কোন কারণ না থাকে, তাহা হইলে প্রথমটী গিয়া দ্বিতীয়টীকে, দ্বিতীয়টী তৃতীয়টীকে, এইরূপ শেষে ঊনবিংশ গোলাটী বিংশ গোলাটীকে আঘাত করিবে। প্রথম গোলাটীকে যে বলের সহিত আঘাত করা হইল, যদি সেই বলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায়, এবং প্রতিকূল অবস্থা সকলের শক্তি (অর্থাৎ ভূমির বন্ধুরতা, বায়ুর প্রতিঘাত ইত্যাদি) নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথম গোলাটী যখন চলিল, তখনই ঠিক্ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বিংশ গোলাটী চলিবে কি না। কেবল তাহাই নহে। কয় মুহূর্ত্ত পরে শেষ গোলাটীতে আঘাত লাগিবে ও উহা চলিবে, তাহা নিঃসন্দেহ গণনা করা যাইতে পারে। প্রথম গোলাটীর গতির উৎপত্তি হইতে, শেষ গোলাটীর গতি উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত যে কয়েকটী ঘটনা হইল, উহা কার্য্য-কারণশৃঙ্খল মাত্র। পরবর্ত্তী আঘাতের কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী আঘাত, আর সেই পরবর্ত্তী আঘাত, তৎপরবর্ত্তী আঘাতের কারণ, সুতরাং * * * যাহা একটী ঘটনা সম্বন্ধে কার্য্য, তাহাই

কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা রহিয়াছে। কার্য্যকারণের সহিত উক্ত প্রকার স্বাধীনতার বিরোধ নাই। রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতা ও অধীনতা উভয়ই সমভাবে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের অন্তর্ব্বর্ত্তী।

আবার আর একটী ঘটনা সম্বন্ধে কারণ হইতেছে। ঘটনা সকল পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য ও কারণ হইতেছে।

"সামান্য গোলার বিষয়ে যে কথা বলা হইল, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনা সম্বন্ধে সেই কথা খাটিবে। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে নিয়ম বলেন, তাহা আর কিছুই নহে, এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধীয় প্রণালী মাত্র। সমান কারণ সমান অবস্থায় সমান কার্য্য উৎপাদন করে, ইহা দেখিয়া আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান হইয়াছে। কোন একটী ঘটনা এক প্রাকৃতিক অবস্থায়, এক প্রকার কার্য্য উৎপাদন করিল। আবার সেইরূপ ঘটনা অবিকল সেইরূপ অবস্থায় ঠিক্ সেইরূপ কার্য্য উৎপাদন করিল, এই প্রকার পুনঃ পুনঃ দেখিয়াই আমরা বুঝিয়াছি যে, প্রকৃতি নিয়মানুসারে চলিতেছে। ইহাতে কিছুই বিশৃঙ্খলা নাই। কোন ঘটনাই আকস্মিক নহে।" †

হরিদ্বার হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত জলপরমাণুর পর জলপরমাণুরাশি এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া যেমন ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে, সেইরূপ সৃষ্টিকাল হইতে চিরদিন ঘটনা-স্রোত বহিয়া আসিতেছে। বিধিবদ্ধ ঘটনাপ্রবাহকেই নিয়ম বলে। এই নিয়মশৃঙ্খলে সুবিশাল বিশ্ব চিরবদ্ধ।

কার্য্যকারণ ও ভবিষ্যদ্বাণী।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ। সুতরাং ভাবীঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব। যদি আমরা কার্য্য-কারণশৃঙ্খল পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাই, তাহা হইলে যে সকল

---

† "বিবিধসন্দর্ভ" ৮৬ ও ৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।

ঘটনা ভবিষ্যতের গর্ভে রহিয়াছে, পূর্ব্ব হইতেই তাহা জানিতে পারি। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল ধরিয়া মানবের মন ভবিষ্যতের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে। কার্য্য-কারণ নিরূপণ করিতে পারিলেই ভাবী ঘটনাপুঞ্জ আমাদের জ্ঞান-নয়নের সম্মুখবর্ত্তী হয়। কার্য্য-কারণ নিরূপণ করিতে পারিনা বলিয়াই ভবিষ্যতে কি হইবে জানিতে পারি না। যে পরিমাণে এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের নিয়ম বা কার্য্যকারণসম্বন্ধ বুঝিতে পারি, সেই পরিমাণে আমাদের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়। কার্য্যকারণশৃঙ্খলবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে বহুসংখ্যক গোলা পরে পরে সাজাইয়া প্রথমটিতে আঘাত করিবামাত্র, নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, শেষ গোলাটি স্থান-চ্যুত হইবে কিনা, যদি হয়, ঠিক্ কতক্ষণ পরে হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা বহু কাল পূর্ব্ব হইতে আকাশবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীসম্বন্ধীয় ভাবী ঘটনা বলিয়া দিতে পারেন। গ্রহ উপগ্রহ সকল অখণ্ডনীয় নিয়মে বদ্ধ। নিয়ম আছে বলিয়াই তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইতেছে। নিয়ম বা কার্য্যকারণশৃঙ্খল না থাকিলে কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ কখন কোন গ্রহণ গণনা করিতে সক্ষম হইতেন না।

বহির্জ্জগৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ বলিয়া যে পরিমাণে আমরা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি, সেই পরিমাণে ভাবীঘটনা বলিয়া দিতে পারি। সেইরূপ অন্তর্জ্জগৎও যদি অখণ্ডনীয় নিয়মে,—কার্য্যকারণশৃঙ্খলে চিরবদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধেও ভাবী জ্ঞান সম্ভব হইবে না কেন? কার্য্য-কারণশৃঙ্খল যদি সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়, তাহা হইলে মানসিক বিষয়েও ভবিষ্যদ্বাণী হইবে না কেন? যে কারণে জড়জগতের

ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী হইতে পারে, ঠিক্ সেই কারণেই মনোজগতের ঘটনা সম্বন্ধেও উহা সম্পূর্ণ সম্ভব।

আমাদের জীবন উভয় জগতের সম্মিলনভূমি। সুতরাং জীবনের ঘটনাপুঞ্জ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবজ্জীবনের ঘটনাবলী সেই অখণ্ডনীয় নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ।

জড় ও মন উভয়ই যখন নিয়মে বদ্ধ, তখন উভয় সম্বন্ধীয় ঘটনারই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব। কেবল সম্ভব কেন? বহুকাল হইতে বৈজ্ঞানিকেরা ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিতেছেন। ধূমকেতুর উদয় ও গ্রহণ সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা বহুকাল হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিতেছেন। গ্রহ উপগ্রহ বিষয়ক নিয়মাদির জ্ঞান কতকটা লাভ করা হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা অক্লেশে উক্ত ঘটনা সকল বহুদিন পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পান।

যে পরিমাণে বিজ্ঞান উন্নতি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, মনুষ্য, সেই পরিমাণে, জগতের ভাবীঘটনার জ্ঞান লাভ করিতে থাকিবে। এই শতাব্দীতে বিজ্ঞান যতটুকু উন্নত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, বিজ্ঞানের এখন শৈশবাবস্থা মাত্র। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অতি অল্প বিষয়েরই ভবিষ্যৎ দেখিতে পান। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশ বিষয়েরই এখন ভাবী জ্ঞান অসম্ভব। কেননা, সে সকলের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান এখনও মনুষ্য উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। মনুষ্য যদি সকল বিষয়েরই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে সকল বিষয়েরই ভাবী ঘটনা বলিয়া দিতে

পারিত। জড়জগৎ সম্বন্ধে যেমন বলিয়া দিতে পারিত এবং এখনই কিয়ৎ পরিমাণে পারে, মনোজগৎ সম্বন্ধেও অবশ্য সেইরূপ পারিত। জড় ও মন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল ঘটনারই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইবে। আমার জীবনের প্রত্যেক ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক্ আছে। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ জানিতে পারিলে প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কার্য্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইবে। এখন যেমন বলা যায়, কবে ধূমকেতুর উদয় হইবে, কবে চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সেই প্রকার আমাদের জ্ঞান অধিকতর উন্নত হইলে আমরা বলিতে পারিব, কবে অমুক ব্যক্তি একটি মিথ্যাকথা বলিবে, কবে সে প্রবঞ্চনা করিয়া আপনার ভ্রাতার সম্পত্তি অপহরণ করিবে, কবে সে নরহত্যা করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে; অথবা কবে সে অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া জনসমাজের হিতসাধন করিবে। সামাজিক বিষয়েও সেইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারিবে যে, কতদিন পরে প্রচলিত উপধর্ম্ম বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইবে, আর কত দিন ভারতবর্ষ বিদেশীয় জাতির অধীন থাকিবে।

কার্য্য-কারণ-প্রবাহ চিরদিন বহিতেছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জগতের সকল ঘটনাই পূর্ব্ব হইতে ঠিক্ আছে। জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এক মহা অচ্ছেদ্য-সূত্রে বদ্ধ।

কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ।

এই ঘোরতর কারণবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল অদৃষ্টবাদ। একটি হইতে আর একটি অতি সহজে নিষ্পন্ন হয়। সুপ্রসিদ্ধ জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল সাহেব, ইউরোপে প্রচলিত কারণবাদ এবং

আসিয়ায় প্রচলিত অদৃষ্টবাদের মধ্যে বিভিন্নতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার একখানি সুগভীর গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, আসিয়া-বাসীদিগের অদৃষ্টবাদ, মনুষ্যের অদৃষ্টকে কোন অজ্ঞাত বা দৈবশক্তির অধীন করে; কিন্তু ইউরোপীয় কারণবাদ, কার্য্যকারণসম্বন্ধদ্বারা মনুষ্যের কার্য্য-কলাপ ব্যাখ্যা করে।

"Real fatalism is of two kinds. Pure Asiatic fatalism, the fatalism of Oedipus, holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our wishes may be, a superior or an abstract destiny will over-rule them and compel us to act, not as we desire, but in the manner pre-destined. The other kind, modified fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, our will by our desires, and our desires by the joint influence of motives presented to us, and of our individual character."

বহির্জগতে সমুদয় ঘটনা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ। যখন যাহা সংঘটিত হয়, প্রথম হইতে তাহা স্থির আছে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এক অখণ্ডনীয় সূত্রে লম্বমান রহিয়াছে। সুতরাং কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলে মনুষ্য প্রত্যেক ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে। জড়-জগতের ন্যায় মনোজগৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে, মানব-চরিত্র সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব। ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনে যাহা কিছু সংঘটিত হয়, প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্য-

বাণী সম্ভব। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাই ভবিষ্যদ্দৃষ্টি বিকসিত হইতে দেয় না।

উপরি উক্ত কথাগুলি যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে কারণ-বাদ ও অদৃষ্টবাদ পরিণামে ও ফলে একই হইয়া যায়। ইউরোপীয় কারণবাদী ও ভারতবর্ষীয় অদৃষ্টবাদী বিভিন্ন পথ দিয়া একই গম্য-স্থানে উপনীত হইতেছেন। কারণ-বাদ বলে, যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে; কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলকে কেহ লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। অদৃষ্টবাদ বলে, যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে; বিশেষভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এবং সমগ্র-ভাবে জনসমাজে, অখণ্ডনীয় ঘটনা-স্রোত নিরন্তর বহিতেছে, লেশমাত্র বিচলিত হইবার নহে।

এই কারণবাদ হইতে কি কি কথা নিষ্পন্ন হইতেছে? ১ম— যাহা প্রথম হইতেই ঠিক্ আছে, তাহা এখন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সুতরাং আত্মচেষ্টা বৃথা। কেহ বলিতে পারেন, আত্মচেষ্টা কি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের অন্তর্গত হইতে পারে না? যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে, প্রথম হইতেই সকলই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে, নূতন কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, এই প্রকার সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে, কেহ আপনার শুভাশুভ বিষয়ে কখন চেষ্টা করিতে পারে না; করা অসম্ভব।

২য়ঃ—ন্যায় অন্যায় শব্দের বাস্তবিক কোন অর্থ নাই। যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। আমি নূতন কিছু করিতে পারি না। সুতরাং কোন বিষয়ে আমার দায়িত্ব সম্ভব নহে। ভাল কার্য্য করিতে পারিতাম, স্বাধীনভাবে তাহার অন্যথা করিয়াছি, এরূপস্থলেই অন্যায় শব্দের প্রয়োগ

হইতে পারে। কিন্তু ভাল বল, আর মন্দই বল, কোন কার্য্য যখন আমার নিজের হাতে নাই, তখন সেস্থলে ন্যায় অন্যায় শব্দের কোন অর্থ থাকে না।

ন্যায় অন্যায়ের মূলে দায়িত্ববোধ; দায়িত্ববোধের মূলে স্বাধীনতা। কিন্তু যেখানে অখণ্ডনীয় কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল, সেখানে স্বাধীনতা অসম্ভব। সুতরাং দায়িত্ববোধ ও তাহার ফলস্বরূপ ন্যায় অন্যায় ও পাপ পুণ্য অসম্ভব।

দার্শনিক কুটিলতর্কের ব্যূহভেদে অক্ষম সরলচিত্ত ব্যক্তি বলিবেন, "আমাকে কোথায় আনিলে? দার্শনিক তর্কসূত্র অবলম্বন করিয়া চলিলে কি শেষে এমন ভয়ানক স্থানে উপনীত হইতে হয়, যেখানে ভাল হইবার জন্য চেষ্টা নাই, ন্যায় অন্যায় নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই?"

বাস্তবিক কি মানুষ সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খলবদ্ধ? মানুষের মধ্যে কি এমন একটু স্থান নাই যেখানে স্বাধীনতা বর্ত্তমান রহিয়াছে? ভয় নাই! মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্থান আছে। মানুষ বুদ্ধিজীবী কল নহে।

স্বাধীনতার স্থান কোথায়?

স্বাধীনতার স্থান কোথায়? মানসিক অবস্থা সকল নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। নদীর তরঙ্গের ন্যায় মনুষ্যমনের অবস্থা সকল ক্রমাগত উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে। জন্মদিবস হইতে অদ্য পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল মানসিক অবস্থা সকলের স্রোত বহিয়া আসিতেছে। একটার পর আর একটা, তাহার পর আবার একটা, এইরূপ চলিতেছে, কোনটাই স্থায়ী হয় না।

কিন্তু এই সকল কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলবদ্ধ, পরিবর্ত্তনশীল, অস্থায়ী

অবস্থা ব্যতীত মানুষের মধ্যে কি এমন কিছু নাই যাহা কার্য্য-কারণ-সূত্রের অতীত এবং সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থায়ী? নিশ্চয়ই আছে; আমি নিজেই তাহা। মানসিক অবস্থা সকলের নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু আমি চিরদিন একই রহিয়াছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম, এখনও সেই আমি। পাঁচ শতটী মানসিক অবস্থা একটীর পর আর একটী উদয় হইল, অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু এই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সাধারণ কিছু আছে;—সকল অবস্থাগুলিই আমার। মানসিক অবস্থা সকল অসংখ্য; কিন্তু আমি এক। মানসিক অবস্থা সকল নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু আমি অপরিবর্ত্তনীয়। স্মৃতিশক্তি ভূতকাল ও বর্ত্তমানের সংযোগ সাধন করিতেছে। সুতরাং ইহা বলিতেই হইবে যে, অন্তর্জগতে এমন কিছু আছে, যাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অস্থায়ী ঘটনাস্রোতের মধ্যে, অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থায়ীরূপে, কাল-স্রোতের অতীত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

যাহাকে 'আমি' বলি, তাহাই আত্মা। এই অপরিবর্ত্তনীয়, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের অতীত আত্মাই স্বাধীনতার বাসভূমি। মানসিক অবস্থাস্রোতের উৎসপ্রদেশে,—জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছাসমন্বিত প্রাকৃতিক যবনিকার অন্তরালে স্বাধীনতার অবস্থিতি।

কার্য্যকারণসূত্রের সীমা—মানসিক অবস্থা সকল (mental phenomena); কিন্তু আমি বা আত্মা মানসিক অবস্থা নহে। মানসিক অবস্থা সকলের অস্তিত্ব, আমি বা আত্মার উপরে নির্ভর করে। আত্মারূপ সাগরে, মানসিক অবস্থারূপ অগণ্য তরঙ্গ উঠিতেছে ও মিশাইতেছে। আমি বা আত্মা কার্য্যকারণ-সূত্রের অতীত; সুতরাং উহাই স্বাধীনতার অধিষ্ঠান-ভূমি।

পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মনুষ্যের স্বাধীনতা।

আন্তরিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। পরমেশ্বর যখন ত্রিকালজ্ঞ, প্রত্যেক মনুষ্যের ভাবীজীবনের প্রত্যেক ঘটনা যখন তাঁহার অসীম জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, পাপ কি পুণ্য যাহাই কেন কর না, সকলই যখন তিনি পুর্ব্ব হইতে জানেন, তখন মনুষ্যের স্বাধীনতা কোথায়? তিনি যেরূপ জানেন সেইরূপই ঘটিবে; কাহার সাধ্য তাহা অন্যথা করে?

এই আপত্তিটি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে সরল ভাবে স্বীকার করিতেছি যে, আত্মার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যতপ্রকার যুক্তি আছে, তন্মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ইহার মীমাংসা করা সহজ নহে। যাহা হউক, এসম্বন্ধে যাহা কিছু বুঝি, যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করিতেছি।

প্রথমতঃ পরমেশ্বরের জ্ঞান ও মানুষের কার্য্য এ উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। তিনি জানেন বলিয়া মানুষ করে, এমন নহে; মানুষ করে বলিয়া তিনি জানেন। আমি একটি মিথ্যাকথা বলিয়াছি, তুমি জান। তুমি জান বলিয়া আমি বলিয়াছি, এমন নহে; আমি বলিয়াছি বলিয়াই তুমি জান। তোমার জ্ঞান ও আমার মিথ্যাকথা বলা, এ উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। তুমি জান, সুতরাং এমন কেহ বলিবে না যে, আমি স্বাধীনভাবে মিথ্যাকথা বলি নাই। তুমি জানিতে পারিয়াছ বলিয়া যে, আমার সত্য বলিবার ক্ষমতা ছিল না, এরূপ নহে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, ভাবীকার্য্যের সহিত অতীত

কার্য্যের তুলনা কেমন করিয়া হইবে? উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অসাদৃশ্যই বা কোথায়? ইহাই কেবল দেখ যে, অতীত কার্য্যের সহিত যেমন তদ্বিষয়ক জ্ঞানের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ ভাবীকার্য্যের সহিতও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের কার্য্যকারণসম্বন্ধ নাই। আমরা স্বাধীনভাবে যাহা করিব, ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বর তাহা জানেন। তাহাতে আমাদের স্বাধীনতা লোপ হইবে কেন? তিনি মনুষ্যকে স্বাধীনশক্তি দিয়াছেন। সেই স্বাধীনশক্তির কি ফল হইবে,—প্রত্যেক মনুষ্য স্বাধীনতার কিরূপ ব্যবহার করিবে, অনন্ত পুরুষ তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানেন; ইহাতে স্বাধীনতার বিনাশ হইবে কেন? আবার বলি, তাঁহার ভাবীজ্ঞানের সহিত মনুষ্যের কার্য্যের সহিত তো কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। তিনি যদি মনুষ্যকে বলপূর্ব্বক পাপ ও পুণ্য কার্য্য করাইয়া দিতেন, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের স্বাধীন ক্রিয়া থাকিত না। তিনি তো বলপূর্ব্বক কাজ করান না; তিনি কেবল জানেন, আমরা কি করিব। তাহাতে আমাদের স্বাধীনতা চলিয়া যাইবে কেন?

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বর যাহা জানেন, মনুষ্য কি তাহার অন্যথা করিতে পারে? আমি কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ দুষ্কর্ম্ম করিব, পরমেশ্বর জানেন, আমি কি তাহার অন্যথা করিতে পারি? আমি কি সেই দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে পারি?

পরমেশ্বর যাহা জানেন, তাহা হইতে বিরত হইবার ক্ষমতা অবশ্য আমাদের আছে। বিরত হইবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই

আমাদের কার্য্য স্বাধীন কার্য্য। পরমেশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন-শক্তি দিয়াছেন। সুতরাং আমরা যাহা করিব, তাহা না করিবার শক্তি আমাদের আছে;—তাহা হইতে বিরত হইবার শক্তি অবশ্য আমাদের আছে; কিন্তু আমরা বিরত হইব না, আমরা ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার করিব, ইহাই তিনি জানেন। আমাদের স্বাধীনশক্তির কিরূপ ব্যবহার করিব, তাহাই তিনি জানেন।

এ সকল কথাতে অনেকে সন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহারা বলিবেন যে, যে কার্য্য স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কি পূর্ব্ব হইতে জানা যাইতে পারে? স্বাধীন-শক্তি-প্রসূত কার্য্যের কি ভাবীজ্ঞান সম্ভব? আমরা যতদূর জানি, মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু পরিমিত মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া কি অনন্ত পরমেশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব? পরমেশ্বরকে মানুষের মত মনে করার ন্যায় ভ্রমান্ধতা আর কি আছে? মনুষ্য যাহা পারে না, পরমেশ্বরও কি তাহা পারেন না? মনুষ্য পূর্ব্ব হইতে স্বাধীনতা-প্রসূত-কার্য্য জানিতে পারে না বলিয়া কি পরমেশ্বরও পারেন না? ইহার তুল্য অসার ও অসঙ্গত কথা আর কি আছে? পরমেশ্বরের ভাবীজ্ঞান এবং মনুষ্যের স্বাধীনকার্য্যের সামঞ্জস্য আমরা ধারণা করিতে পারি না। এ কথা যথার্থ। কিন্তু আমরা ধারণা করিতে না পারিলেই যে সত্য অসত্য হইয়া যাইবে, এমন নহে। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না, অথচ তাহা সত্য। আমাদের ধারণাশক্তির অতীত হইলেও, স্বাধীনকার্য্যের ভাবীজ্ঞান অনন্তস্বরূপের পক্ষে সম্ভব।

অপরাধের বার্ষিকসংখ্যা ও স্বাধীনতা।

ইউরোপের অন্তর্গত ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশ হইয়াছে যে, জাল, নরহত্যা প্রভৃতি প্রত্যেক অপরাধের সংখ্যা প্রতি বর্ষে প্রায় সমান। অধিক তারতম্য নাই। এমন কি, গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত ডাকঘর সম্বন্ধীয় বিবরণে দেখা যায় যে, লোকের সামান্ত প্রকার ভুলের সংখ্যাও প্রতি বৎসর প্রায় সমান। অনেক লোক পত্রের শিরোনামায় ঠিকানা না দিয়া ডাকে পত্র ফেলিয়া দেয়। এইরূপ পত্রের বার্ষিক সংখ্যা প্রায় সমান।

স্বাধীনতাবিরোধী বলেন যে, যদি অস্মার স্বাধীনতা থাকিত. তাহা হইলে মনুষ্যের অপরাধের সংখ্যা, এমন কি, তাহার ভ্রান্তির সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে প্রায় সমান হইবে কেন? মানবাত্মা যখন স্বাধীন, যখন তাহার আপনার উপরে কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে, যখন সে অধিক করিতে পারে, অল্প করিতে পারে, না করিতেও পারে, তখন তাহার কার্য্যের এরূপ সমতা থাকে কেন? প্রাকৃতিক নিয়মানুগত ঘটনার ন্যায়, মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় ঘটনার সমতা ও একীভাব থাকে কেন?

সমগ্র দেশের মধ্যে যত অপরাধ সংঘটিত হয়, গবর্ণমেণ্ট যে তাহার প্রকৃত সংখ্যা জানিতে ও প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। রাজকর্ম্মচারীদিগের যত্নে যে সকল অপরাধ প্রকাশ ও প্রমাণ হয়, তাহারই সংখ্যা উক্ত বিবরণীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রকাশিত অপরাধের সংখ্যাই আমরা জানিতে পারি। যাহা প্রকাশ হইল না, সেই সকল অপরাধের প্রকৃত সংখ্যা কত তাহা কে বলিবে? স্বাধীনতাবিরোধী

বলিতে পারেন যে, এখন প্রতি বর্ষে অপরাধের সংখ্যা ঠিক্ সমান হয় না; কতক্ পরিমাণে তারতম্য থাকে। গড়ে প্রায় সমান হয়। এখন যে সকল অপরাধ অপ্রকাশিত থাকিতেছে, যদি তাহা প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে, হয়ত, এখন যে তারতম্য রহিয়াছে, তাহা থাকিত না। বার্ষিক সংখ্যা ঠিক্ সমান হইত। কিন্তু উহার বিপরীত হইলেও ত হইতে পারে? অপ্রকাশিত অপরাধ প্রকাশিত হইলে যে, তারতম্য আরও অনেক পরিমাণে অধিক হইত না, তাহার নিশ্চয়তা কি?

আর একটি কথা, অপরাধের বাহ্য আকার এক প্রকার হইলেই যে উহা বাস্তবিক এক প্রকারের অপরাধ, তাহা কখনই হইতে পারে না। একজন লোভপরবশ হইয়া আপনার ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার জন্য চৌর্য্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; আর একজন দরিদ্রতার কশাঘাতে অস্থির হইয়া ক্ষুধার জ্বালায় পরস্বাপহরণ করিল, এ উভয়ের কার্য্যই কখন একবিধ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। একজন আপনার ধর্ম্মপত্নীর ব্যভিচার দেখিয়া হঠাৎ ক্রোধ ও দুঃখে বিবেচনাশূন্য হইয়া তাহাকে হত্যা করিল; আর একজন আপনার নিজের ব্যভিচারের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য নিরপরাধিনী সাধ্বী সতীর প্রাণ বিনাশ করিল; এই উভয় কার্য্যই এক প্রকার পাপ বলিয়া কখন গণ্য হইতে পারে না। যদি সকল অপরাধ প্রকাশ হইত, অপরাধের প্রকৃত সংখ্যা জানা যাইত, এবং অপরাধ সকলের কেবল মাত্র বাহ্য আকার না দেখিয়া, যে ভাবে, যে অভিপ্রায়ে, অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তদনুসারে উহা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা হইত, তাহা হইলে এক্ষণে যেমন অনেক পরিমাণে

অপরাধ সংখ্যার সমতা দৃষ্ট হইতেছে, ঠিক্ তাহা হইত কি না, কে বলিবে?

যাহা হউক, বর্ষে বর্ষে চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা অনেক পরিমাণে সমান হয় বলিয়াই যে, আত্মার স্বাধীনতা অপ্রমাণ হইল, ইহা কোন কার্য্যেরই কথা নহে। ইহাতে স্বাধীনতার মত খণ্ডিত হয় না। স্বাধীনতার সীমা আছে, মনুষ্য অনেক পরিমাণে শিক্ষা, অবস্থা, ও অভ্যাসের অধীন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

মনুষ্যের অন্যান্য শক্তির ন্যায়, আত্মানিহিত স্বাধীনশক্তিরও উন্নতি ও বিকাশ আবশ্যক। সকল স্থলে তাহা হয় না। এমন কি অধিকাংশ স্থলেই তাহা উপযুক্ত পরিমাণে হয় না। সুতরাং প্রতিকূল অবস্থার সহিত, প্রবল প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনার নির্দ্দোষিতা ও সাধুতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সকলে যত্ন করে না।

যে শ্রেণীর লোক সর্ব্বদা চৌর্য্য, জাল, নরহত্যা, প্রভৃতি দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের প্রকৃতি বাল্যাবধি কুসংসর্গ, কুশিক্ষা এবং বিবিধ প্রতিকূল অবস্থা নিবন্ধন এতদূর বিকৃত হইয়া গিয়াছে,—তাহারা কুঅভ্যাসের এরূপ অধীন হইয়া পড়িয়াছে যে, আত্মার স্বাধীন শক্তি, পাপের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি,—তাহাদের মধ্যে অল্পই প্রকাশ পায়। যে শক্তি থাকাতে মনুষ্য প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনার নির্দ্দোষিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করে, অবস্থা ও শিক্ষার দোষে, তাহাদের সেই স্বাভাবিক শক্তি, অনেক পরিমাণে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় লুক্কায়িত রহিয়াছে। মনুষ্য অনেক

স্থলে, পিতা মাতার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, কুসংসর্গ এবং চতুঃপার্শ্বের অনিষ্টকর দৃষ্টান্তে ক্রমে ক্রমে পশুর ন্যায় হইয়া যায়। তাহার মনুষ্যত্ব যেন চলিয়া যায়। প্রবৃত্তি ও প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিতে সে শিক্ষা করে না। বায়ুসঞ্চালিত শুষ্ক তৃণের ন্যায়, প্রবৃত্তি ও প্রলোভনদ্বারা পরিচালিত হয়। গবর্ণমেণ্ট যে অপরাধের বিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহা অধিকাংশই এই মনুষ্যত্ব-বিহীন, পশুবৎ প্রবৃত্তির অধীন, জনসমাজের অধম শ্রেণীভুক্ত লোকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ঐ সকল লোকের চরিত্র সাধারণতঃ এক ভাবেই থাকে; প্রায়ই কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের অপরাধের যে বিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহা প্রতি বর্ষে অনেক পরিমাণে সমান হইবারই সম্ভাবনা।

জনসমাজের যে শ্রেণীভুক্ত লোক আত্মার স্বাধীন শক্তির পরিচালনা করিতে শিক্ষা করিয়াছে, যাহারা প্রবৃত্তি ও প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিয়া, জয়ী হইতে শিখিয়াছে, তাহাদের প্রলোভন জয়ের বিবরণ জানিবার উপায় নাই। কত লোক প্রলোভনের অধীন হইয়া দুষ্কার্য্য করিল, তাহা আমরা সংগৃহীত বিবরণে কতক পরিমাণে জানিলাম; কিন্তু কত লোক আত্ম-শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিল, তাহার বিবরণ ত কেহ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে না। প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে, আত্মশক্তির উপযুক্ত ব্যবহারদ্বারা, আপনার নির্দ্দোষিতা রক্ষা করাতেই মানবপ্রকৃতিনিহিত স্বাধীন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

যাঁহারা মনে করেন যে, কোন জাতির বার্ষিক অপরাধের

সংখ্যা চিরকালই অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাঁহাদের ভ্রান্তি সহজেই বুঝা যায়। জাতীয় নৈতিক অবস্থা যখন যেমন,—বিবেক ও অধ্যাত্ম-শক্তির বিকাশ যখন যেমন,—জাতীয় অপরাধের সংখ্যাও তখন সেই পরিমাণ হইবে। জাতীয় নৈতিক অবস্থা যেমন, জাতীয় পাপ পুণ্যের অবস্থাও তদনুরূপ হইবে। এ উভয়ই একই কথা।

উত্তাপের পরিমাণ যেমন, তাপমান যন্ত্রের পারদের ঊর্দ্ধ-গতিও তদনুরূপ হইবে। উত্তাপ অধিক হউক, বা অল্প হউক, পারদ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উঠিবেই উঠিবে, ইহা কখনই হয় না। যেমন কারণ, তেমনই কার্য্য। লোকের আধ্যাত্মিক অবস্থা যখন যেমন,—বিবেক ও নৈতিক শক্তির অবস্থা যখন যেমন,—জনসমাজে পাপ ও পুণ্যানুষ্ঠানের পরিমাণও তদনুযায়ী হইবে। সুতরাং জাতীয় অপরাধের সংখ্যা কখনই সমান থাকে না।

জাতীয় নৈতিক অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয় না? যে সকল অবস্থা নিবন্ধন লোকে দুর্নীতিপরায়ণ হইতেছে, তাহা বিদূরিত করিয়া দাও, নিশ্চয়ই দেখিবে, লোকচরিত্র অনেক পরিমাণে পবিত্র ও উন্নত হইবে। বুদ্ধিগত শিক্ষাদ্বারা যেমন বুদ্ধিবৃত্তি নিচয় মার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই রূপ ধর্ম্মশিক্ষাদ্বারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি সংসাধিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশিক্ষাদ্বারা মানবাত্মানিহিত স্বাধীন শক্তির উপযুক্ত বিকাশ হয়। তখন মানুষ আপনার নৈতিক কর্ত্তৃত্ব সুস্পষ্ট অনুভব করে,—পাপ-প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনার পবিত্রতা রক্ষা করে।

কে বলিবে, মানব চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না? সুরাপায়ী কি মিতাচারী হয় না? ব্যভিচারী কি সচ্চরিত্র হয় না? পরস্বা-

পহারী কি সাধু হয় না? চরিত্রের এ প্রকার পরিবর্ত্তন জন-সমাজে সর্ব্বদাই লক্ষিত হয়। যেখানে অন্তরের প্রবৃত্তি এবং বাহিরের প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম আছে, সেখানে চরিত্রের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি নিশ্চয়ই ঘটিবে।

যাহারা বলেন যে, প্রতি বর্ষে অপরাধের সংখ্যা গড়ে সমান হইবেই হইবে, একটি কথা তাঁহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক; প্রতি বর্ষে যত মাতাল মদ ছাড়ে; বা যত ব্যভি-চারী সচ্চরিত্র হয়, গড়পড়তা সমান রাখিবার জন্য কি সেই পরিমাণ ভাল লোককে মাতাল ও ব্যভিচারী হইতে হইবে? ইহার তুল্য অযুক্ত ও হাস্যকর কথা আর কি আছে?

জাতীয় অপরাধের সংখ্যা চিরকালই সমান থাকিবে, ইহা নিতান্ত ভুল কথা। আমাদের দেশের বাস্তব ঘটনা উহা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। সকলেই জানেন, এদেশে দস্যুর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে; সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে দস্যুবৃত্তিও হ্রাস হইয়াছে। ইংলণ্ডের প্রতিবর্ষের পুলিস রিপোর্ট তুলনা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, সেখানে ক্রমে ক্রমে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যাইতেছে।

মনুষ্য অবস্থার অধীন, ইহা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু ইহাও সত্য যে, মনুষ্যের ভিতরে এমন এক শক্তি আছে, যদ্দারা মনুষ্য অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে পারে। যে পরি-মাণে ঐ শক্তির বিকাশ হয়, সেই পরিমাণে মানুষ অবস্থার অধী-নতা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়।

এই উভয়ই প্রত্যক্ষের বিষয়। যেমন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মানুষ অবস্থার দাস হইয়া কার্য্য করিতেছে, সেইরূপ

আবার ইহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতেছে।

স্বাধীনতায় বিশ্বাস স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ।

আত্মার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটী প্রধান আপত্তি খণ্ডিত হইল। কিন্তু মানবাত্মা যে বাস্তবিক স্বাধীন, তাহার প্রমাণ কি? আমি আছি, জগৎ আছে, ইহার প্রমাণ কি? মনুষ্যের স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, বিশ্বজনীন বিশ্বাসই ইহার প্রমাণ। যে প্রমাণে জানি আমি আছি, সেই প্রমাণে জানি আমি স্বাধীন। এই স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের মূল। যদি স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অস্বীকার কর, অনন্তকাল তর্ক করিলেও কোন সত্যে উপনীত হইতে পারিবে না।

যে প্রমাণে জানি আমি আছি, সেই প্রমাণে জানি আমার স্বাধীনতা আছে। একজন ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত * "আমি আছি" এই সহজ কথাটী তর্কদ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি আছি, কেননা আমি চিন্তা করি।" কিন্তু ইহাই কি প্রমাণ হইল? আমি আছি, ইহার প্রমাণ, আমি চিন্তা করি। কিন্তু আমি যে চিন্তা করি, তাহার প্রমাণ কি? স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আপনার প্রমাণ আপনি। স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস ভিন্ন আমি যে আছি, ইহার অন্য প্রমাণ সম্ভব নহে। †

---

* ডেকার্ট্।

† ডেকার্ট্ বলিয়াছেন ;—"I am, because I think." এই কথার খণ্ডনে তাঁহার একজন সমালোচক বলিয়াছেন ;—"His thinking required as much proof as his being."

স্বাধীনতায় বিশ্বাস কিরূপে প্রকাশ পায়?

আমাদের আপনার কর্ত্তৃত্বে স্বাভাবিক বিশ্বাস তিন প্রকারে প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ কার্য্যের পূর্ব্বে। কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমরা অনুভব করি যে, আমরা উহা করিতে পারি, না করিতেও পারি। দ্বিতীয়তঃ কার্য্য করিবার সময় আমরা অনুভব করি যে, আমরা ঐ কার্য্যটী করিতে পারি, অথবা উহা হইতে বিরত হইতে পারি। তৃতীয়তঃ কার্য্য করিবার পরে আমরা বিশ্বাস করি যে, উহা না করিলেও করিতে পারিতাম। এই শেষোক্ত প্রকার বিশ্বাসের জন্য আমরা দুষ্কার্য্য করিয়া অনুতপ্ত হই।

পরীক্ষাগারে উপস্থিত হইয়া ছাত্র যখন দেখেন যে, যেরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, একটু যত্ন করিয়া শিক্ষা করিলেই অনায়াসে তাহার সদুত্তর করিতে পারিতেন, তখন তাঁহার মনে অনুতাপ উপস্থিত হয়। ছাত্রের এই অনুতাপের মূল কি? তাঁহার নিজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস। তিনি তাঁহার অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন যে, তিনি আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পড়া শুনায় মনোযোগী হইতে পারিতেন। এরূপ অবস্থায় ছাত্র বলেন,—"হায়! কেন আমি আর একটু মনোযোগী হইয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম না!" দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পাপী যখন আপনার অন্তরে ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তাহার মূলে স্বাধীনতায় বিশ্বাস। "হায়! কেন আমি এমন পাপ করিলাম!" এই কথায় মূলে স্বাধীনতায় বিশ্বাস। মূলে স্বাধীনতায় বিশ্বাস না থাকিলে অনুতাপ অসম্ভব হইত। যদি মানবাত্মার স্বাধীনতা না থাকে, মনুষ্য যদি কেবল বুদ্ধিজীবী যন্ত্র হয়, তাহা হইলে

পাপের জন্ম অনুতাপের কোন অর্থ ই থাকে না। অনুতাপ অর্থ-শূন্ত কার্য্য,—নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়া পড়ে। মহাকবি সেক্‌পিয়র-বর্ণিত নরহত্যাকারী ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ভেদী অনুশোচনা কেবল বৃথা ক্রন্দন মাত্র হইয়া পড়ে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, অন্তরের এবং বাহিরের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া দুকার্য্যকারী অনুতাপ করিতেছে। নতুবা যদি সে পূর্ব্বের অবস্থায় পুনঃস্থাপিত হয়, তাহা হইলে কি, সে পুনর্ব্বার সেই দুষ্কর্ম্ম করেনা? অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই সে অনুতপ্ত হইয়াছে;—মনে করিতেছে যে, সে তাহার অনুষ্ঠিত পাপ না করিলেও করিতে পারিত।

এ কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মনুষ্য কার্য্য করিবার সময়েই অনুভব করে যে, সে উহা না করিলেও করিতে পারে; সে বিশ্বাস করে যে, তাহার ভিতরে এমন এক শক্তি আছে যে, সে উহা হইতে বিরত হইতে পারে। ইহা আমরা অনেক সময় সুস্পষ্টরূপে অনুভব করি। ঐ প্রকার অনুভব করাতে আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস প্রকাশ পায়। কেমন করিয়া বলিব যে, এখন অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই কেবল অনুতপ্ত অপরাধী মনে করিতেছে যে, সে তাহার অনুষ্ঠিত দুকার্য্য না করিলেও করিতে পারিত? যখন দুকার্য্য করিবার সময়েই মানুষ অনুভব করে যে, সে উহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, কেবল অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্যই সে এখন মনে করিতেছে যে, সে তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্য না করিলেও করিতে পারিত? ১ম,

কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আন্দোলন ও বিচার; ২য়, কার্য্য করিবার সময়ে সুস্পষ্ট অনুভব করা যে, উহা হইতে বিরত হইতে পারি; ৩য়, কার্য্য করিবার পর অনুতাপ। এই তিন অবস্থাতেই স্বাধীনতার স্বাভাবিক সহজ বিশ্বাস প্রকাশ পায়।

স্বাধীনতার বিশ্বাস আছে বলিয়া মানুষ দুষ্কার্য্য করিয়া আপনাকে আপনি তিরস্কার করে, এবং সৎকার্য্য করিয়া আত্ম-প্রসাদ সম্ভোগ করে।

সেইরূপ, স্বাধীনতার বিশ্বাস আছে বলিয়া মানুষ অন্যের নিন্দা প্রশংসায় প্রবৃত্ত হয়। নিজের বিষয়ে যেমন, পরের বিষয়েও সেইরূপ।

মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ব্যভিচারী, নরহন্তা, মনুষ্য যতই কেন দুষ্ক্রিয়াসক্ত হউক না, তাহাকে তুমি ঘৃণা করিতেছ কেন? তাহার নিন্দা করিবার তোমার অধিকার কি? যদি তাহার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা না থাকে; যদি এরূপ হয় যে, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে তাহার দেহ মন দিবারজনী দৃঢ়নিবদ্ধ,—নিয়মচক্রে প্রতিনিয়ত ভ্রাম্যমান্,—তবে তাহার অপরাধ কি? আবার যে পবিত্রচেতা সাধু, লোকহিতব্রতে শরীর মন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারই বা এত প্রশংসা করিতেছ কেন? তিনিও ত অখণ্ডনীয় নিয়মের দাস মাত্র?

একথার একটী উত্তর আছে। সুন্দর পদার্থ দেখিলে প্রীত হওয়া মনুষ্যের স্বভাব। সুন্দর গোলাব, সুন্দর চন্দ্রমা দেখিয়া কে না আনন্দিত হয়? ভাল জিনিস দেখিলেই লোকে তাহাকে স্বভাবতঃ ভাল বাসে, কুৎসিৎ বস্তু দেখিলেই তাহাকে স্বভাবতঃ ঘৃণা করে। চন্দ্র স্বাধীন ইচ্ছায় সুন্দর হয় নাই, এবং পঙ্ক

স্বাধীন ইচ্ছায় মলিন হয় নাই; অথচ আমাদের এমনই প্রকৃতি যে, আমরা একটাকে ভাল না বাসিয়া এবং অপরটাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারি না, মনুষ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। ভাল লোককে আমরা স্বভাবতঃ ভাল বাসি, মন্দ লোককে স্বভাবতঃ ঘৃণা করি। স্বাধীনতা থাকুক, না থাকুক, তাহাতে কি আসিয়া গেল?

এই সকল কথার উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, স্বাধীনতা না থাকিলে, মন্দ লোককে মন্দ অবশ্য বলিবে, কিন্তু তাহাকে অপরাধী বলিতে পারিবে না; কেননা সে নিয়মের দাস। ভাল লোককে ভাল অবশ্য বলিবে, কিন্তু ভাল হওয়াতে তাহার যে নিজের কিছুই "বাহাদুরী" নাই, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; কেননা তিনিও নিয়মের দাস। যে বসন্তরোগী রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, যে গলিতকুষ্ঠরোগপ্রপীড়িত দরিদ্র পথে বসিয়া চীৎকার করিতেছে, উহাদিগকে কি তুমি ঘৃণা কর? লোকের বাড়ী বাড়ী উহাদের রোগের জন্য কি উহাদের নিন্দা করিয়া বেড়াও? তাহা যদি না কর, তবে তোমার যে প্রতিবাসী চৌর্য্য-বৃত্তি-প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার কেন নিন্দা করিতেছ? চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা সমাজের যত অনিষ্ট সংঘটিত হয়, সংক্রামক বসন্তরোগে কি তদপেক্ষা কিছু অল্প অনিষ্ট হয়? বসন্ত ও কুষ্ঠরোগ যেমন নিয়মের ফল, স্বাধীনতা না থাকিলে চৌর্য্যবৃত্তিও কি সেইরূপ নহে? সেইজন্য বলিতেছি যে, এখন যে ভাবে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে নিন্দা ও প্রশংসা চলিতেছে, তাহা আত্মার স্বাধীনতায় স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, ও বিশ্বজনীন বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবী ফল।

বিবেচনা ও স্বাধীনতা।

মনুষ্য কার্য্য করিবার সময় বিবেচনা করে। বিবেচনার মূলে স্বাধীনতার বিশ্বাস রহিয়াছে। স্বাধীনতার বিশ্বাস না থাকিলে মনুষ্য কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে বিচার করিত না। স্বাধীনতার বিশ্বাস কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারের প্রাণ। যদি স্বাধীনতা না থাকে, তবে ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান কালের সমুদয় ঘটনা এক অখণ্ডনীয় কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ। তবে বিবেচনা করিব কেন? যাহা হইবার তাহাই হইবে, বিবেচনা করিয়া ফল কি?

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, যে সকল শক্তিতে মনুষ্যকে কার্য্য করাইতেছে, তন্মধ্যে বিবেচনাও একটী। বিবেচনাও সেই অখণ্ডনীয় কার্য্যকারণশৃঙ্খলের মধ্যে। কিন্তু এ কথা বলিলে চলিবে না। মনুষ্য যদি যথার্থই বিশ্বাস করে যে, তাহার স্বাধীনতা নাই, সে অচ্ছেদ্য কার্য্যকারণশৃঙ্খলে চির-বদ্ধ,—প্রাকৃতিকশক্তিপরিচালিত যন্ত্র মাত্র, তাহা হইলে কি সে আর বিবেচনা করিতে পারে? তাহা হইলে কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারের অস্তিত্ব সম্ভব হয়? সকলই অখণ্ডনীয় কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ।

জগতের সমুদয় ঘটনা প্রথম হইতেই স্থির রহিয়াছে। বহির্জগৎ কি অন্তর্জগৎ উভয় সম্বন্ধীয়, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনা, এক অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে চিরদিন লম্বমান। কবে মানুষ কি করিবে, —তাহার জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যই—প্রথম হইতে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; কার্য্যকারণশৃঙ্খলের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক ঘটনায় ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব। যদি কাহারও এরূপ সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট বিশ্বাস থাকে, তাহার পক্ষে

কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ বিষয়ে বিচার, বিতর্ক সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে ব্যক্তি বিচার করে, বিতর্ক করে, তাহার মত যাহাই কেন হউক না, কার্য্যতঃ সে ব্যক্তি আত্মার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। বাস্তবিক মানুষের মত যাহাই কেন হউক না, তর্কের সময় মানুষ যাহাই কেন বলুকনা, কার্য্যতঃ তাহাকে স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। কার্য্যের সময় মানবহৃদয়নিহিত স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, বিশ্বজনীন বিশ্বাস প্রকাশ পাইবেই পাইবে।

ন্যায়অন্যায়বোধ ও স্বাধীনতা।

বিবেচনা সম্বন্ধে যেমন, ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধেও সেইরূপ। ন্যায় অন্যায়ের মূলে স্বাধীনতা। যদি বল স্বাধীনতা নাই, তাহা-হইলে ন্যায়, অন্যায়, পাপ, পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই। কিন্তু বিবেচনা, বিচার, বিতর্ক, মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক;—উহা যেমন মানবপ্রকৃতি হইতে কখনই উন্মূলিত হইতে পারে-না,—সেইরূপ ন্যায়অন্যায়বোধ সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক; উহা মানবপ্রকৃতি হইতে কখনই উন্মূলিত হইতে পারেনা। সুতরাং স্বাধীনতাবিরোধীদিগের মত মানবপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ;—মানবপ্রকৃতির মধ্যে অবিনশ্বররূপে নিহিত ভাব ও শক্তির বিরুদ্ধ।

যদি গ্রহকে বল, তুমি এ পথে চলিওনা, একটু সরিয়া চল, গ্রহ কথা কহিতে পারিলে বলিবে, আমি অখণ্ডনীয় নিয়মের চিরদাস, আমার কক্ষ হইতে তিলার্দ্ধ বিচ্যুত হইবার আমার শক্তি নাই। মাতালকে যদি বল, তুমি সুরাপান করিও না, মাতাল বলিবে, আমি অখণ্ডনীয় নিয়মের চিরদাস; সুরাপান

না করিবার আমার লেশ মাত্র শক্তি নাই। যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা না করিলেও করিতে পারিতাম, এইরূপ বিশ্বাস না থাকিলে ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকিতে পারেনা। যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, ইহা সত্য হইলে ন্যায় অন্যায়ের কোন অর্থই থাকেনা।

দায়িত্ববোধ ও স্বাধীনতা।

ন্যায়অন্যায়ের মূলে দায়িত্ববোধ। দায়িত্ববোধ ব্যতীত ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থশূন্য বাক্য। দায়িত্ববোধ, স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ ও বিশ্বজনীন। আস্তিক বা নাস্তিক কেহই আপনার হৃদয় হইতে দায়িত্ববোধ বিদূরিত করিয়া দিতে পারেনা। কোন নির্জ্জন বনে লক্ষ টাকা পড়িয়া রহিয়াছে। আমি চিরদরিদ্র; আমার পরিবারের অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ কিছুতেই ঘুচেনা। আমি ঐ টাকা আত্মসাৎ করিব, না, উহার প্রকৃত অধিকারীকে অন্বেষণ করিয়া তাহার হস্তে উহা সমর্পণ করিব? এই আন্দোলনে আমার চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমি কি করিব? আমার স্বার্থবুদ্ধি বলিতেছে, ঐ টাকা লইয়া আপনার দুঃখ নিবৃত্তি কর; আমার বিবেক বলিতেছে, উহার স্বত্বাধিকারীকে অন্বেষণ করিয়া তাহার হস্তে উহা সমর্পণ কর। এই আন্দোলনে আমার চিত্ত আন্দোলিত। যে অর্থ দেখিতে পাইলাম, উহার সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব আছে। অন্তরে অন্তরে দায়িত্ববোধ না থাকিলে ঐ আন্দোলন অসম্ভব।

নির্জ্জনগৃহে অন্ধকারে আমার হস্তে দশ সহস্র মুদ্রা দিয়া একজন বলিল,—"আমি বিদেশে চলিলাম; যদি সেখানে আমার মৃত্যু হয়, ঐ অর্থ আমার সন্তানদিগকে দিও"। যথার্থই তাহার

বিদেশে মৃত্যু হইল। সাক্ষী নাই, দলিল নাই, সে ব্যক্তির উত্তরাধীকারীগণ জানে না যে, সে আমার নিকটে অর্থ রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সে অর্থ তাহাদিগকে দিব কিনা? আমার স্বার্থবুদ্ধি বলিতেছে, দিওনা; আমার ধর্ম্মবুদ্ধি বলিতেছে, দাও। আমার হৃদয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই আন্দোলনের মূলে, ঐ অর্থ সম্বন্ধে আমার দায়িত্ববোধ। কিন্তু দায়িত্ব-বোধের মূলে কি? স্বাধীনতা। আমি ভাবিতেছি, আমি এখন কি করি। ঐ অর্থ আত্মসাৎ করা অথবা উহা প্রকৃত স্বত্বাধি-কারিদিগের হস্তে সমর্পণ করা, এই উভয় চিন্তায় আমার চিত্ত দোলায়মান। অর্থ আত্মসাৎ করা অথবা উহা অর্থের স্বত্বাধি-কারিদিগকে অর্পণ করা এই উভয় কার্য্যই আমার হাতে। আমি ইহাও করিতে পারি, উহাও করিতে পারি। এখন কি করিব? এই চিন্তার মূলে স্বাধীনতায় বিশ্বাস রহিয়াছে। স্বাধী-নতায় বিশ্বাস না থাকিলে উক্তরূপ চিন্তা বা আন্দোলন সম্ভব হইত না। যদি আমার সুদৃঢ় সুস্পষ্ট বিশ্বাস থাকিত যে, যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, হইতেছে, ও হইবে;—আমি অখণ্ড-নীয় নিয়মের চিরদাস;—কার্য্যকারণশৃঙ্খল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে, আমার জীবনের প্রত্যেক ভাবী ঘটনায় ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইত,—তাহা হইলে উক্তরূপ চিন্তা, উক্তরূপ আন্দোলন সম্ভব হইবে কেন? তাহা হইলে আমি কেন মনে করিব যে, ঐ অর্থ উহার স্বত্বাধিকারিদিগকে সমর্পণ করা বা না করা আমার হাতে?

এস্থলে কেহ মনে করিতে পারেন যে, যেরূপ যুক্তির অনু-সরণ করা হইতেছে, তাহাতে স্বাধীনতায় অবিশ্বাসের মন্দ ফল

প্রদর্শিত হইতেছে। তাহা ত বটেই। কেবল তাহাই নহে। ইহাই প্রতিপন্ন করা প্রধান উদ্দেশ্য যে, স্বাধীনতায় অবিশ্বাস, অবিনশ্বর মানব-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

স্বাধীনতায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস হইলে, কার্য্য সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক চলিয়া যায়। সুতরাং উহা আমাদের অবিনশ্বর বুদ্ধিগত প্রকৃতি (Intellectual nature) বিরুদ্ধ। স্বাধীনতায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস হইলে, ন্যায়, অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, দায়িত্ববোধ চলিয়া যায়। সুতরাং উহা আমাদের অবিনশ্বর নৈতিক প্রকৃতি (Moral nature) বিরুদ্ধ।

আত্মার স্বাধীনতামতের একজন বিরোধী দেখিলেন যে, তাঁহার তরুণবয়স্ক পুত্র বিদ্যা শিক্ষায় অনাবিষ্ট হইয়া দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া পুত্রকে তিরস্কার করিতে ও উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্র পিতাকে বলিল, আপনি কেন আমাকে তিরস্কার করিতেছেন? আপনি ত জানেন যে, সকলই কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ। আমি নিজে স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারি না। আমার প্রত্যেক চিন্তা, ইচ্ছা, ও কার্য্য, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের অংশ মাত্র। জগতের সকল ঘটনা অখণ্ডনীয়। উপযুক্ত ভাবী দৃষ্টি থাকিলে, আমি যে মন্দ হইয়া যাইব, ইহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কেহ বলিয়া দিতে পারিত। পিতা বলিলেন, জগতের সমস্ত ঘটনা কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বদ্ধ; এই কারণবাদ সত্য বলিয়াই আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, উপদেশে তোমার মন পরিবর্ত্তিত হইবে। পুত্র বলিলেন, আপনি উপদেশ দিন, কিন্তু হয়ত ইহাই অনাদি কাল হইতে স্থির হইয়া

রহিয়াছে যে, আপনি কলের স্থায় আমাকে তিরস্কার করিবেন, এবং আমিও আপনার তিরস্কার কলের স্থায় অগ্রাহ্য করিয়া মন্দ হইয়া যাইব। কার্য্যকারণশৃঙ্খলে যখন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বদ্ধ, তখন ভাল হইবার হয় ত ভাল হইব, মন্দ হইবার হয় ত মন্দ হইব।

আর একটা দৃষ্টান্ত। ঐ যে সম্মুখে ঘড়ীটা টিক্ টিক্ করিতেছে, মনে কর, উহার জ্ঞান আছে। ঘড়িতে তিনটার সময় একটা বাজিল। তুমি বিরক্ত হইয়া ঘড়ীকে বলিলে, "ঘড়ি তোমার ইহা বড় অন্যায়, মিথ্যা কথা বল কেন?" ঘড়ী বলিল, —"আমার দোষ কি? আমি কল মাত্র। আমার স্বাধীনতা নাই; সুতরাং অপরাধ নাই, অনুতাপও নাই।" বাস্তবিক, তিনটার সময় একটা বাজার জন্য ঘড়ী আপনাকে অপরাধী মনে করিতে পারে না; এবং অনুতপ্ত হইয়া আক্ষেপ করিতেও পারে না,—"হায়! হায়! আমি কি করিলাম! আমি মহা পাপী!"

মনুষ্যেরও যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সে জ্ঞানবিশিষ্ট কল মাত্র, তবে সে কখনই অনুতাপ করিতে পারে না। করা অসম্ভব। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, অনেক লোক ত আত্মার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না, তথাচ তাঁহারা অন্যায় কর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করেন কেন? এই জন্য যে, কারণবাদের মতে তাঁহাদের সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই।

যেমন অনুশোচনা অসম্ভব, সেইরূপ চেষ্টা ও যত্নও অসম্ভব। ঘড়ীর দৃষ্টান্ত পুনর্ব্বার গ্রহণ কর। যে ঘড়ীতে তিনটার সময় একটা বাজিল, তাহাকে তুমি বল, "ঘড়ি! তুমি ভবিষ্যতে আর

এমন কর্ম্ম করিও না। ঠিক্ তিনটার সময়, যাহাতে তিনটা বাজে, তাহাই করিবে। ঘড়ী উত্তর করিতে পারিলে বলিত, "আমি কল, চেষ্টা করিবার আমার সাধ্য কি?"

মনুষ্য-ঘড়ীও সেই প্রকার বলিবে,—"আমি কি করিব? নিয়তির অবিনশ্বর পুস্তকে যাহা লিখিত রহিয়াছে, তাহাই হইবে।"

এখন দেখা যাইতেছে যে, আত্মার স্বাধীনতায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস জন্মিলে, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে কল মনে করিলে, উৎকর্ষলাভ বা সংশোধনের চেষ্টা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আলস্য সম্পূর্ণ প্রশ্রয় পাইবে। সুতরাং সংসারের যারপরনাই অমঙ্গল সংঘটিত হইবে। দায়িত্ববোধও চলিয়া যাইবে, কেননা যে কল, তাহার আবার দায়িত্ব কি?

কর্ত্তৃত্ব, পাপপুণ্য ও স্বাধীনতা।

স্বাধীনতাতত্ত্ব বিশদরূপে বুঝিতে হইলে আর একটী বিষয় ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। মানবীয় কার্য্যের কর্ত্তা কে? অবশ্য মনুষ্য নিজে। অর্থাৎ আত্মা বা আমি কর্ত্তা। আত্মা বলিলে যাহা বুঝায়, আমি বলিলে তাহাই বুঝায়। মনুষ্য মাত্রেই আপনার কর্ত্তৃত্ব আপনি সর্ব্বদা অনুভব করে।

কর্ত্তৃত্বের জ্ঞান আমরা কোথা হইতে পাই? বহির্জ্জগতে কোথাও কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। বহির্জ্জগতে নিয়ত নিরপেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা, এবং নিয়ত নিরপেক্ষ পরবর্ত্তী ঘটনা ব্যতীত বৈজ্ঞানিক আর কিছুই দেখিতে পান না; বহির্জ্জগতে কর্ত্তৃত্ব কোথায়? অন্তর্জ্জগৎ ভিন্ন কর্ত্তৃত্ব আর কোথাও লক্ষিত হয় না। আত্মাই প্রকৃত কারণ, আর সব নিয়ত নির-

পেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনামাত্র। কর্ত্তৃত্বের জ্ঞান, আমরা আত্মা হইতেই প্রাপ্ত হই।

আমার ভিতরে এই কর্ত্তৃত্ব বা শক্তি প্রত্যক্ষ করি। বহির্জগতে যে শক্তি আছে, তাহাতে বিশ্বাস করি। বহির্জগতে যে শক্তি রহিয়াছে, উহা ব্রহ্মশক্তি। জীবের ভিতরে জীব-শক্তি। যদি মানবাত্মার স্বাধীনতা অস্বীকার কর, তাহা হইলে দুটী শক্তি থাকে না; একমাত্র ব্রহ্মশক্তি। বহির্জগতে যে শক্তি, উহা ব্রহ্ম-শক্তি এবং মানবাত্মার ভিতরে যে শক্তি উহাও ব্রহ্মশক্তি। মানবাত্মায় ও জড়জগতে যে শক্তি বর্ত্তমান, উহা দুই শক্তি নহে, একই শক্তি। যদি বল মানবাত্মার স্বাধীনতা নাই, তবে ইহাই বলা হইল যে, যে শক্তিতে বহির্জগৎ চলিতেছে, সেই শক্তি-দ্বারা মানবাত্মা পরিচালিত হইতেছে। একই ব্রহ্মশক্তি জড় ও আত্মাকে নিয়ত পরিচালিত করিতেছে।

জড়জগতে স্বাধীনতা নাই। জড়জগৎ কলের ন্যায় ব্রহ্মশক্তি-দ্বারা নিয়ত পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং জড়জগতের সকল ঘটনা সকল কার্য্যই ব্রহ্মের কার্য্য। আত্মার যদি স্বাধীনতা না থাকে, তবে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, মানব-চরিত্রের সকল ঘটনা, মনুষ্যের সকল কার্য্যই ব্রহ্মের কার্য্য। মনুষ্যের কার্য্য,ও পরমেশ্বরের কার্য্য এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিল না। কেননা, এই উভয়ই একমাত্র ব্রহ্মশক্তি হইতে উৎপন্ন; উভয়বিধ কার্য্যই ব্রহ্মের কার্য্য।

এখন দেখ। মনুষ্যের স্বাধীনতা না থাকিলে পাপ, পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই ব্রহ্মের কার্য্য হইয়া যায়। মনুষ্য যত প্রকার দুষ্কার্য্য করিতেছে, চৌর্য্য, প্রতারণা, ব্যভিচার, নরহত্যা, এক

কথায়, মানুষ যত প্রকার কার্য্যদ্বারা আপনাকে কলঙ্কিত ও অন্যের সর্ব্বনাশ করিতেছে, সকলই ব্রহ্মের কার্য্য হইয়া যায়। যে সকল কার্য্য মানবসমাজে ভয়ঙ্কর পাপ বলিয়া গণ্য,সে সকলই পবিত্রস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মের অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে পাপ পুণ্য কিছুই থাকেনা। লোকের সর্ব্বনাশ করা ও উপকার করা একবিধ কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। কেননা, উভয়ই পরমেশ্বরের কার্য্য।

এই ভয়ঙ্কর মত,—এই মানবসমাজের সর্ব্বনাশকারী মত, মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ। ন্যায়, অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্মে বিশ্বাস, মানব প্রকৃতির গভীরতম স্থানে অবিনশ্বর স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন লিখিত রহিয়াছে। মানবাত্মার স্বাধীনতা অস্বীকার করিলে এক ব্রহ্ম-শক্তি মাত্র থাকে। সুতরাং পাপ পুণ্য কিছুই থাকেনা। চৌর্য্য ও দান; সত্যনিষ্ঠা ও প্রতারণা; সতীত্ব ও ব্যভিচার; অর্থ-লোভে নরহত্যা এবং দয়াপরবশ হইয়া অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ সমর্পণ করা, এ সকলই একবিধ কার্য্য হইয়া যায়; কেননা, এ সকলই সেই পবিত্রস্বরূপ, পূর্ণব্রহ্মের কার্য্য।

ভ্রান্তি ও স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা বিরোধীদিগের মধ্যে যিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বীকার করেন, তাঁহাকে এস্থলে নিরস্ত হইতে হইবেই হইবে। কিন্তু যিনি তর্কের খাতিরে ধর্ম্মাধর্ম্মের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, পাপ, স্বীকার না কর, কিন্তু ভ্রান্তি ত স্বীকার করিবে? মানুষ অভ্রান্ত জীব নহে, পদে পদে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সকল বিষয়ে তাহার ভ্রম হয়, ইহা কে না জানে? যদি বল, যাহা কিছু মানুষ করিতেছে, তাহা ব্রহ্মই করিতেছেন,

কেননা, ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তি নাই, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের ভুল, ভ্রান্তি যাহা কিছু সকলই সেই "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্মের" ভুল ভ্রান্তি !! অভ্রান্ত ব্রহ্মের ভ্রান্তি !! আমি যাইব শান্তিপুর, পথ ভুলিয়া যশোহরের দিকে চলিলাম। ইহা কাহার ভুল? নিশ্চয়ই আমার নহে, কেননা, আমার স্বতন্ত্র শক্তি নাই। উহা অভ্রান্ত ব্রহ্মেরই ভুল!! তুমি একটা সামান্য অঙ্ক কসিতে, হিসাব করিতে," ভুল করিয়া ফেলিলে। উহা তোমার ভুল, না, ব্রহ্মের ভুল? যদি মনুষ্যের স্বতন্ত্র শক্তি না থাকে, যদি ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় শক্তি না থাকে, তাহা হইলে ইহা বলিতেই হইবে যে, ব্রহ্ম অঙ্ক কসিলেন, হিসাব করিলেন, ব্রহ্মই ভুল করিলেন !! সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীনতা বিরোধীদিগের মত স্বীকার করিলে, পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বরের ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হয় !!

কর্ত্তৃত্ববোধ ও স্বাধীনতা।

মনুষ্য মাত্রেই নিজের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বদা অনুভব করে। "আমি করিতেছি," "তুমি করিতেছ," "তিনি করিতেছেন," এই সকল কথার মূলে কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস রহিয়াছে। যখনই বলি, আমি করিতেছি বা করিব, তখনই আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করি; —আপনার কর্ত্তৃত্ব আপনি সুস্পষ্ট অনুভব করি। মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বদাই এইরূপ অনুভব করিতেছে। এই অনুভব করার জন্যই প্রতি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে।

এই বিশ্বাস,এই অনুভব কি ভ্রান্তি? তাহা হইলে ত সকলই ভ্রান্তি। যদি মানবপ্রকৃতির মৌলিক ভাবকে ভ্রান্তি বল,— যদি স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, বিশ্বজনীন ভাব সকলকে ভ্রান্তি

বল, তাহা হইলে জগতে সত্য বলিয়া কিছুই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। সকল প্রকার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যের মূলে ঐ সকল স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, বিশ্বজনীন ভাব ও বিশ্বাস। এ সকল মৌলিক ভাব। উহারা আপনার প্রমাণ আপনি; উহাদের অন্য প্রমাণ নাই।

"আমি করি" এই বোধ যদি ভ্রান্তি হয়, তবে "আমি জানি" এই বোধটিও ভ্রান্তি বলিয়া গণ্য হইবে না কেন? জ্ঞান, ভাব, বাসনা ও কর্তৃত্ব, এই কয়েকটি ভিন্ন আমাদের ভিতরে আর কিছুই নাই। মানসিক ক্রিয়া সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইলে এই কয়েকটি ভিন্ন আর কিছুই পাই না। যদি কর্তৃত্ব অস্বীকার কর, যদিবল, "আমি"করি," মানুষের এই বোধ ভ্রান্তি মাত্র, তাহা হইলে, "আমি জানি" এই বোধটিকেও ভ্রান্তি কেন বল না? জ্ঞান, ভাব, বাসনা ও কর্তৃত্ব, এই কয়েকটিই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এই কয়েকটিই আমাদের প্রকৃতির মূলে স্থিতি করিতেছে। যদি কর্তৃত্ব অস্বীকার কর, তবে জ্ঞান প্রভৃতি কেন অস্বীকার কর না? যদি বল, কর্তৃত্ব নাই, তবে কেন বলনা, জ্ঞান নাই? "আমি করি" এই স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, বিশ্বজনীন, বিশ্বাস যদি ভ্রান্তি হয়, তবে "আমি জানি" এই স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বজনীন বিশ্বাস ভ্রান্তি হইবে না কেন? একটি যদি অস্বীকার করিতে পারি, তবে অন্যটিকে পারিব ,না কেন? যে প্রকারে কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতেছ, সেই প্রকারেই কি সর্ব্ববিধ জ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাৎ,—সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাইতে পারে না?

আমি "করিতেছি," এবং আমি "স্বাধীনভাবে করিতেছি,"

এ দুই একই কথা। যদি অন্য কোন ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধীনে কোন কার্য্য আমার ভিতর দিয়া হইয়া যায়, তাহা কখনই আমার কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যদি আর একজন সম্পূর্ণ বলের সহিত, আমার স্বাধীনতা লোপ করিয়া আমার হাত দিয়া কোন কথা লিখিয়া দেয়, উহা নিশ্চয়ই আমার লেখা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

জগতে যদি এক ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তি না থাকে, তাহা হইলে সকল ঘটনা, সকল কার্য্যই সেই এক শক্তির কার্য্য। যে শক্তিতে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র চলিতেছে, যে শক্তিদ্বারা জল, স্থল, শূন্যে যাবতীয় ঘটনা উৎপন্ন হইতেছে, সেই শক্তিদ্বারাই মানবজীবনের সমুদায় ঘটনা, সমুদায় কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে। মনুষ্যের সমুদয় কার্য্য, সেই শক্তির কার্য্য। সুতরাং মানুষ কোন বিষয়েই বলিতে পারে না, আমি করিতেছি। যদি বলে, উহা ভ্রান্তবাক্য মাত্র।

সম্পূর্ণরূপে অন্য শক্তিদ্বারা যে কার্য্য হয়, তাহা কখনও আমার কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং আমি করিতেছি, এবং আমি স্বাধীনভাবে করিতেছি, এ উভয়ই একই কথা।

মানবপ্রকৃতির এই যে মৌলিক ভাব রহিয়াছে,—এই যে স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ কর্তৃত্ববোধ রহিয়াছে, ইহাতেই মানবাত্মার স্বাধীনতা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। আমি চিন্তা করিতেছি, অনুভব করিতেছি, কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতেছি, কথা কহিতেছি, যাইতেছি, খাইতেছি, ইত্যাদি সকল কথাতেই মনুষ্যের স্বাধীনতা প্রকাশ পাইতেছে।

যেমন আমরা একদিকে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ঐশী শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতেছি, সেইরূপ আবার অন্যদিকে আমাদের ভিতরের স্বাধীন শক্তি প্রয়োগ করিয়া, অনেক কার্য্য করিতেছি। আমরা যে কেবল অন্যের হাতের যন্ত্র নহি, আমাদের নিজের কর্তৃত্ব আছে, ইহা পদে পদে অনুভব করি। যখন কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া চিন্তা করি, যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য সকল দিক্ দেখিয়া বিবেচনা করি, তখন সুস্পষ্ট অনুভব করি যে, আমরা নিজে আত্মশক্তি প্রয়োগ করিতেছি। যখন বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করি, তখন আপনার শক্তি আপনি অনুভব করি। এই স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, বিশ্বজনীন অনুভবকে ভ্রান্তি বলিলে, জগতে কিছুই সত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

বিশুদ্ধ যুক্তিমার্গ অনুসরণ করিয়া এতক্ষণ কি দেখিলাম, এবং কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, সংক্ষেপে তাহার পুনরালোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলে জড়জগৎ ও মানবমন বদ্ধ, মনুষ্যের ভিতরে তাহার অতীত স্থান আছে। তাহাই স্বাধীনতার অধিষ্ঠানভূমি। দ্বিতীয়তঃ পরমেশ্বরের ত্রিকালজ্ঞতা মনুষ্যের স্বাধীনতাকে বিনাশ করে না। তৃতীয়তঃ দেশ বিশেষে বার্ষিক অপরাধের সংখ্যার অনেক পরিমাণে সমতা, স্বাধীনতার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করে না। চতুর্থতঃ মনুষ্য কার্য্য করিবার পূর্ব্বে, কার্য্য করিবার সময়, এবং কার্য্য করিবার পরে, আপনার স্বাধীনতা আপনি অনুভব করে; সেই জন্য দুষ্কার্য্য করিয়া অনুতপ্ত হয়; পরস্পরকে সেই জন্য অপরাধী বা নিরপরাধী মনে করে। ইহাতে স্বাধীনতায় স্বাভাবিক, বিশ্বজনীন বিশ্বাস প্রকাশ পায়। পঞ্চমতঃ স্বাধীনতায় বিশ্বাস বিলুপ্ত

হইলে, কার্য্য বিষয়ে বিবেচনা ও বিচার সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায়। ষষ্ঠতঃ ন্যায়অন্যায়বোধের মূলে স্বাধীনতা। স্বাধীনতায় বিশ্বাস না থাকিলে ন্যায়, অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ বিনষ্ট হইয়া যায়। সপ্তমতঃ স্বাধীনতায় বিশ্বাস না থাকিলে দায়িত্ববোধ থাকে না। দায়িত্ববোধ না থাকিলে পাপ, পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কিছুই থাকে না। সদসদ্বিচার, ন্যায়অন্যায়বোধ, এবং দায়িত্ববোধকে বিনাশ করে বলিয়া স্বাধীনতাবিরোধীদিগের মত, মানবপ্রকৃতির গৌরবস্বরূপ বুদ্ধিগতপ্রকৃতি ও ধর্ম্ম-প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অষ্টমতঃ স্বাধীনতাবিরোধীদিগের মতে সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিলে উদ্যোগ ও চেষ্টা একেবারে বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হইবে। সংক্ষেপতঃ যাহাতে মনুষ্যের মহত্ত্ব ও গৌরব,—মানবপ্রকৃতির মধ্যে এরূপ যাহা কিছু আছে,—স্বাধীনতাবিরোধীদিগের মত, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করিয়া মনুষ্যকে পশুতুল্য বা জড়তুল্য করিয়া ফেলিবে। কিন্তু ভয় নাই! কোন দার্শনিক মত কখন মানবপ্রকৃতিনিহিত অবিনশ্বর শক্তিনিচয়ের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না। তার্কিকেরা চিরকালই তর্ক করিয়া আসিতেছেন, কত অসম্ভব ও অস্বাভাবিক মত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যাহা স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ ও বিশ্বজনীন, তাহার প্রভাব চির-দিনই মনুষ্যসমাজে প্রকাশিত। স্থান বিশেষে, কাল বিশেষে, স্বভাবের আলোক, বিশেষ কারণবশতঃ ক্ষীণ বা উজ্জ্বল হইতে পারে, কিন্তু কাহার সাধ্য, তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত করে!

স্বাধীনতাতেই মানবের গৌরব। পরমেশ্বর মনুষ্যকে বলিতেছেন,—"আমি তোমাকে আমার গোলাম করিতে চাহি

না, তুমি আমার স্বাধীন সন্তান।” ক্রীতদাসের সহিত তাহার প্রভুর যে সম্বন্ধ, মনুষ্যের সহিত পরমেশ্বরের সে সম্বন্ধ নহে। স্বাধীন প্রজার সহিত রাজার যে সম্বন্ধ, পিতা, মাতার সহিত সন্তানের যে সম্বন্ধ, সদ্‌গুরুর সহিত শিষ্যের যে সম্বন্ধ, মনুষ্যের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ তাহার অনুরূপ।

স্বাধীনতা আছে বলিয়াই মনুষ্য জ্ঞান ও ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে নিজের হস্তের যন্ত্র করিয়া পরিচালিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলে আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের আস্বাদ পাইতাম না। আমাদের ধর্ম্মলাভ হইত না। আমাদিগকে ধর্ম্ম দিবেন বলিয়াই স্বাধীনতা দিয়াছেন। স্বাধীনতা সকল মঙ্গলের উৎসস্বরূপ। আমরা তাঁহার কৃপাপ্রদত্ত যত প্রকার দান সম্ভোগ করিতেছি, তন্মধ্যে স্বাধীনতা একটী অমূল্য উচ্চতম দান! ধন্য তাঁহার কৃপা! তাঁহার অনন্ত কৃপা-ঋণে আমরা চিরদিন ঋণী। ধন্য তাঁহার কৃপা!!

পাপ কি ?

ধর্ম্মতত্ত্বের একটী মূল কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পাপ পুণ্যের স্বরূপ ধর্ম্মতত্ত্বের একটি মূল কথা।

পাপ পুণ্যের জ্ঞান কাহার নাই? কোন্ জাতি, কোন সম্প্রদায় পাপ পুণ্যে বিশ্বাস না করে? পাপ পুণ্যে বিশ্বাস পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বর্ত্তমান।

পাপপুণ্য বিষয়ে ভ্রান্ত সংস্কার।

পাপবোধ ও পুণ্যবোধ স্বাভাবিক ও বিশ্বজনীন। তথাচ

ইহা নিশ্চয় যে, পাপ ও পুণ্যের স্বরূপ বিষয়ে অতি অল্প লোকেরই প্রকৃত জ্ঞান আছে। পাপ কি, ও পুণ্য কি, জিজ্ঞাসা করিলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়প্রচলিত অনুষ্ঠানসকল স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে, পাপপুণ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান একান্ত তমসাচ্ছন্ন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম শতকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে,—"ভাগীরথীনীরে অবগাহন কর, তোমার শত জন্মের পাপ বিধৌত হইবে,—তোমার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া যাইবে।" শারীরিক মলিনতার ন্যায় পাপ যেন কোন একটা বাহ্য পদার্থ।

কেবল আমাদের দেশে কেন? জ্ঞানালোকসম্পন্ন সুসভ্য ইয়োরোপ ও আমেরিকা খণ্ডের অধিবাসীগণ সাধারণতঃ বিশ্বাস করিতেছেন যে, ব্যক্তিবিশেষের অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্তে, তাঁহার বিশ্বাসী অনুচরগণ পরিত্রাণ লাভ করিবে। যেন পাপ, বাহ্য পদার্থের ন্যায় একের স্কন্ধ হইতে অপরের স্কন্ধে ন্যস্ত করা যায়।

কেবল ইহাই নহে। রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক লোক বিশ্বাস করেন যে, পোপের হস্তে স্বর্গের চাবি। তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তিনি স্বর্গধামের দ্বার খুলিয়া দিতে পারেন।

কেবল ইহাই নহে। খৃষ্টীয় জগতের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পোপের স্বাক্ষরিত ক্ষমাপত্র উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া লোকে মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। যেমন পাপ, তেমনি মূল্যের ক্ষমাপত্র। পাপের গুরুত্ব অনুসারে ক্ষমাপত্রেরও মূল্য অধিক। পোপের নিযুক্ত লোক সকল উহা

বিক্রয় করিতেছে। পয়সা খরচ করিয়া ক্রয় করিতে পারিলেই সকল ভাবনা দূর হইল! যত বড়ই কেন তুমি পাপী হওনা, তোমার পয়সা থাকিলে আর কোন ভয় নাই! তোমার জন্য বাজারে পরিত্রাণ বিক্রয় হইতেছে! তবে দুঃখী লোকের পক্ষে মুস্‌কিল বটে! *

পাপ পুণ্যের স্বরূপ বিষয়ে লোকের অজ্ঞতা নিবন্ধন এই সকল কুসংস্কার সম্ভব হইয়াছে। পাপ কি, পুণ্য কি, লোকে যদি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে অনেক প্রকার অনিষ্টকর কুসংস্কারের হস্ত হইতে রক্ষা পায়।

পাপ কোথা হইতে আসিল?

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন,—পাপ কোথা হইতে আসিল? পাপের সৃষ্টি কে করিল? এই প্রশ্নটি বিশেষরূপে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মুখে শুনা যায়। তাঁহারা প্রায় জিজ্ঞাসা করেন, পাপ কোথা হইতে আসিল? পাপের সৃষ্টি কে করিল? পরমেশ্বর পূর্ণপবিত্র পুরুষ; তাঁহা হইতে পাপের উৎপত্তি যা

* খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত আমাদিগকে এই ক্ষমাপত্র বিক্রয়ের অদ্ভুত সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। এই ক্ষমাপত্র বিক্রয় সম্বন্ধে কখন কখন অতি চমৎকার ঘটনা সঙ্ঘটিত হইত। কোন এক জন ক্ষমাপত্র বিক্রয়কারীর প্রতি এক ব্যক্তি কোন কারণে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। সেই বিক্রয়কারীর নিকটে গিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে বিলক্ষণ প্রহার করে, কত টাকার ক্ষমাপত্র ক্রয় করিলে, তাহার সেই পাপ ক্ষালন হইতে পারে।" বিক্রয়কারী কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ক্ষমাপত্রের উল্লেখ করিল। তখন সে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্ষমাপত্র ক্রয় করিয়া বিক্রয়কারীকে অসঙ্কুচিত ও নির্ভয়চিত্তে বিলক্ষণ—"উত্তম মধ্যম" প্রদান করিয়া গৃহপ্রস্থান করিল!!

সৃষ্টি সম্ভব নহে। সূর্য্য হইতে যেমন অন্ধকার আসিতে পারে না, সেইরূপ পূর্ণপবিত্র পুরুষ হইতে কখনই পাপ আসিতে পারে না। তবে পাপ কোথা হইতে আসিল? পাপের সৃষ্টি কে করিল?

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ এই সমস্তার মীমাংসার জন্ত বলিয়া থাকেন, পরমেশ্বর পাপের সৃষ্টি করেন নাই; সয়তান পাপের সৃষ্টি করিয়াছে। সয়তান পূর্ব্বে স্বর্গলোকে বাস করিত। সে পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হইল বলিয়া তাহাকে স্বর্গ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে পৃথিবীর উৎপত্তি হইলে যখন প্রথম নর নারীর সৃষ্টি হইল, তখন সয়তান কর্ত্তৃক তাহাদের মধ্যে পাপ প্রবিষ্ট হইল।

পুরাতন বাইবেল গ্রন্থে এইরূপ গল্প আছে;—পরমেশ্বর প্রথম নরনারীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে একটি সুন্দর উদ্যানে রাখিয়া দিলেন। বিশেষ করিয়া বলিয়াদিলেন,—তোমরা এই উদ্যানের সকল বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে পার, কেবল "জ্ঞান-বৃক্ষের" ফলভোজন করিও না। প্রথম নরনারী আদম ও হবা পরমেশ্বরের এই আদেশ প্রতিপালন করিতেছিলেন। এমন সময়ে একদিন সয়তান সর্পের রূপ ধারণ করিয়া হবার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্ররোচনা বাক্যে ভুলাইয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে প্রবৃত্ত করিল। হবা নিজে নিষিদ্ধফল ভক্ষণ করিয়া তৎপরে আপনার স্বামী আদমকেও উহা খাওয়াইল। তখন আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্ত পরমেশ্বর তাঁহাদের প্রতি বড় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নিজে উদ্যানে আসিয়া তাঁহাদিগকে অভিশম্পাৎ করিলেন যে, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণকে চিরকাল শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণকে মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করিবে ও প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করিবে। সর্প বুকে হাঁটিবে। পৃথিবীতলে কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। *

---

*"সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্ম্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সর্প খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, ঈশ্বর কি বাস্তবিক কহিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না? তাহাতে নারী সর্পকে কহিল, আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি; কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফল বিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, এবং স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবা। তখন সর্প নারীকে কহিল, কোনক্রমে মরিবা না। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, যে দিনে তোমরা তাহা খাইবা, সেই দিনে তোমাদের চক্ষু প্রসন্ন হইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা। তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুখাদ্যের উৎপাদক ও নয়নের লোভজনক ও কৌশল প্রদানার্থ বাঞ্ছনীয় দেখিয়া তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল, এবং আপনার মত নিজ স্বামীকে দিলে সেও ভোজন করিল। তাহাতে তাহাদের উভয়ের চক্ষু প্রসন্ন হইলে তাহারা আপনাদের উলঙ্গতার বোধ পাইয়া ডুমুর বৃক্ষের পত্র সিঙ্গাইয়া কটিবন্ধন করিল।

"পরে তাহারা দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমনকারী সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইল; তাহাতে আদম ও তাহার স্ত্রী, সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? সে কহিল, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া উলঙ্গতাপ্রযুক্ত ভয় করিয়া আপনাকে লুকাইলাম। তিনি কহিলেন, তুমি উলঙ্গ আছ, ইহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফলভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফলভোজন করিয়াছ? তাহাতে আদম কহিল, তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিল, তাহাতে খাইলাম। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, এ কি করিলা? নারী কহিল সর্প আমাকে ভুলাইল, তাহাতে খাইলাম।"

খৃষ্টিয়ানদিগের মতে প্রথম নর নারী আদম ও হবার মধ্যে সয়তান কর্ত্তৃক পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পরে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে, বংশপরম্পরায় পাপ চলিয়া আসিতেছে।

পাপের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর নহেন; সয়তান পাপ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই সাধারণতঃ খৃষ্টিয়ানদিগের মত। বিশেষরূপে এই মতের সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে, পাপপ্রবেশ বিষয়ক খৃষ্টীয় বা য়িহুদী উপাখ্যানটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

প্রথমতঃ সয়তান সর্পের রূপ ধারণ করিয়া হবাকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলভোজনে প্রবৃত্ত করিল। সর্প কেন বুকে হাঁটে,

---

"পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্যে গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইবা; তুমি বুকে হাঁটিবা, এবং যাবজ্জীবন ধূলীভোজন করিবা। আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশেতে ও তাহার বংশেতে পরস্পর বৈরভাব উৎপন্ন করিব; তাহাতে সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবা।"

"পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনার অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবা; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; ও সে তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। অনন্তর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফলভোজন করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি নিজ স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফলভোজন করিলা, এই জন্যে তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া তাহা ভোগ করিবা, এবং তাহাতে তোমার জন্যে কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবা। তুমি ঘর্ম্মাক্তমুখে আহার করিয়া শেষে মৃত্তিকাতে প্রত্যাগমন করিবা; কেননা তুমি তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছ; তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রত্যাগমন করিবা।"

ধূলি খায়, এবং মনুষ্য কেন তাহার মস্তক চূর্ণ করে ? আমি যদি তোমার পোসাক পরিধান করিয়া কাহাকেও হত্যা করি, প্রাণদণ্ড হইবে আমার, না, তোমার ? আর এক কথা। প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন,—"সর্পের বক্ষস্থলে যে মাংসপেশী আছে, তদ্দ্বারা উহারা সহজে, বিনা ক্লেশে, গমনাগমন করে; তবে বুকে হাঁটায় তাহার শাস্তি হইল কই ?"

যদি বল, আদমের প্রকৃতিতে এমন দুর্ব্বলতা ছিল যে, যখনই প্রলোভন আসিয়া তাহার সম্মুখীন হইল, তখনই তাহার পতন হইল। তবে ইহাই কেন বলনা যে, প্রত্যেক মনুষ্য পরিমিত জীব; সুতরাং তাহাদের প্রকৃতিতে স্বভাবতঃ যে অপূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা হইতেই পাপের উৎপত্তি হইতেছে। মনুষ্যের স্বাভাবিক অপূর্ণতা ও দুর্ব্বলতার ফল, পাপ। শৈশব কালে আমরা প্রত্যেকেই য়িহুদী শাস্ত্রবর্ণিত আদমের ন্যায় নির্দ্দোষ ছিলাম। কিন্তু যখনই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলাম, মনের প্রবৃত্তিসকল বিকাশপ্রাপ্ত হইল, বাহিরের প্রলোভন সকল সম্মুখীন হইল, তখনই স্বাভাবিক অপূর্ণতা ও দুর্ব্বলতাবশতঃ আমাদের পতন হইল। পাপ, মানুষের স্বাভাবিক অপূর্ণতার অবশ্যম্ভাবী ফল।

পুরাণের মতে পৃথিবী বাসুকীর মস্তকে রহিয়াছে। বাসুকী পৃথিবীকে ধারণ না করিলে পৃথিবী পড়িয়া যাইত। কিন্তু বাসুকী কিসের উপর দণ্ডায়মান আছেন ? একটি পর্ব্বতের উপর। পর্ব্বত কিসের উপরে রহিয়াছে ? একটি কূর্ম্মের উপর। শূন্যের উপর আপনাআপনি কোন পদার্থ থাকিতে পারে না, এই বিশ্বাসে উক্তরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবী সর্পের মস্তকে, সর্প পর্ব্বতের উপরে, পর্ব্বত কূর্ম্মের উপরে,

কূর্ম্ম কাহার উপরে অবস্থিতি করিতেছে? কূর্ম্ম যদি ঐশী শক্তিতে আপনাআপনি থাকিতে পারে, তবে ইহাই কেন বলনা যে, আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী ঐশী শক্তিতে আপনা-আপনি আকাশমার্গে স্থিতি করিতেছে? এত কল্পনার প্রয়োজন কি?

য়িহুদী বা খৃষ্টীয় আখ্যায়িকা সম্বন্ধেও ঐ কথা। পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের জগতে পাপ কোথা হইতে আসিল? সূর্য্য হইতে যেমন অন্ধকার আসিতে পারে না, সেইরূপ পবিত্রস্বরূপ হইতে পাপ আসিতে পারে না। এই সমস্যার মীমাংসার জন্য সয়তানের কল্পনা করা হইয়াছে। পরমেশ্বর পাপ সৃষ্টি করিতে পারেন না, সুতরাং সয়তান নামক কোন ব্যক্তি পাপ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সয়তানকে সৃষ্টি করিল কে? * খ্রীষ্টিয়জগৎ বলিতেছে, সয়তানের স্রষ্টা পরমেশ্বর স্বয়ং। পরমেশ্বরের সৃষ্ট জীব সয়তান সর্ব্বপ্রথম পাপ করিল, একথা যদি সম্ভব হয়,—তবে পরমেশ্বরের সৃষ্ট মানুষ,—সর্ব্বপ্রথমে পাপ করিল, একথা অসঙ্গত হইবে কেন? খৃষ্টিয়ানেরা বলেন, মনুষ্য-জাতির আদি পিতা মাতা আদম ও হবা পাপ করিয়াছিলেন। সেই পাপ এখন বংশপরম্পরায় রক্তস্রোতের সহিত চলিতেছে। পরমেশ্বর আদম ও হবাকে যে সুন্দর উদ্যানের মধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন, তথায় একটী জ্ঞানবৃক্ষ ছিল। সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফলভোজন করিয়া আদম ও হবার হিতাহিত জ্ঞান, পাপপুণ্যের জ্ঞান হইল। খৃষ্টিয়ানেরা বলেন, ইহা তাঁহাদের পতন। ইহা

---

* ফ্রান্সিস নিউম্যান বলিয়াছেন,—"If Satan created sin, who created Satan?"

পতন, না, উত্থান ? যে অবস্থায় হিতাহিত জ্ঞান, পাপপুণ্যের জ্ঞান থাকে না, উহা শিশু বা পশুর অবস্থা। আদম ও হবা জ্ঞান লাভ করিয়া হিত ও অহিত, পাপ ও পুণ্যের পার্থ্যক্য বুঝিলেন। ইহা পতন না উত্থান ? অবনতি না উন্নতি ?

আদম ও হবা যে পাপ করিয়াছিলেন, তাহাই ক্রমাগত বংশ-পরম্পরায় সহস্র সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত শোণিত স্রোতের সঙ্গে চলিতেছে। আদিম নর নারীর দুষ্কৃতি হইতে আমাদের নিস্তার নাই। এই মাত্র যে শিশু জন্মগ্রহণ করিল, সেও পাপী ; কেননা আদি পিতা মাতা পাপ করিয়াছিলেন ! ! ইহার নাম মৌলিক পাপ।*

পাপ কোথায় থাকে ? অস্থি, মাংস, শোণিতের মধ্যে অন্বেষণ কর। পবিত্র অস্থি, পবিত্র মাংস, পবিত্র শোণিত) হস্ত, পদ, অঙ্গুলী প্রভৃতি দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পবিত্র। পাপ কোথায় ? সেণ্ট পল বলিয়াছেন,—"তোমরা পরমেশ্বরেব মন্দির।"† এ কথা কেবল মানবাত্মা সম্বন্ধে সত্য নহে, মানব-দেহ সম্বন্ধেও উহা সম্পূর্ণ সত্য। এই দেহ পবিত্র দেবমন্দির। ইহা পবিত্রস্বরূপের পবিত্রহস্তরচিত ; পবিত্রস্বরূপ পরম-দেবতা স্বয়ং এই মন্দিরে অধিষ্ঠান করিতেছেন। এ মন্দিরে পাপ কোথায় ?

মানসিক বৃত্তি ও শক্তি নিচয়ের মধ্যে কি, পাপ অবস্থিতি করিতেছে ? কাম ক্রোধাদির মধ্যে কি পাপ স্বভাবতঃ আছে ? কখনই না।

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। এক ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া

---

* Original sin.

† "Ye are the temple of God."

তরবারহস্তে আর এক জনকে হত্যা করিল। এস্থলে পাপ কোথায়? পাপ কি ঐ তরবারে? পবিত্র তরবার। যে ধাতুতে তরবার নির্ম্মিত হইয়াছে, উহার প্রত্যেক পরমাণু, পরমেশ্বরসৃষ্ট পবিত্র পরমাণু। তরবারে পাপ কোথায়? তবে কি, যে হস্ত তরবার ধারণ করিয়াছে, তাহাতেই পাপ? কখন না। হস্ত, পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর রচিত পবিত্র পদার্থ। উহার অস্থি, মাংস, শিরা, শোণিত সকলই পবিত্র। তবে কি, যে ক্রোধ-বৃত্তির অধীন হইয়া ঐ ব্যক্তি নরহত্যা করিল ঐ ক্রোধই পাপ? কখন না। ক্রোধ কি, অনেক সময় ধর্ম্মের অনুগত হইয়া অন্যায় নিবারণ করে না? তবে ক্রোধ, পাপ কেন হইবে? পাপ তবে কোথায়? তরবারে পাপ নাই, হস্তে পাপ নাই, কোন মানসিক বৃত্তিতে পাপ নাই, পাপ তবে কোথায়? স্বাধীনভাবে ইচ্ছা-পূর্ব্বক উহাদের অপব্যবহারে পাপ। মানুষ অপব্যবহার করে কেন? স্বাধীনতা আছে বলিয়া।

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, মনুষ্যের স্বাধীন শক্তি সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই পরমেশ্বরের ধর্ম্মনিয়মের অনুগত হইয়া চলে না কেন? কেন সর্ব্বদা পবিত্রতা, ন্যায়, দয়া, ও প্রেমের অধীন হইয়া কার্য্য করে না? মানবপ্রকৃতি আলোচনা করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি রহিয়াছে। পশু ও দেবতা উভয়ই বর্ত্তমান। আমি যেন দুই ভাগে বিভক্ত; নীচ আমি ও উচ্চতর আমি। ঐ উচ্চতর আমিই প্রকৃত আমি। ("The true self") এই বিপরীত অবস্থার একত্র সমাবেশের জন্যই পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। *

মানবহৃদয়ে মহাযুদ্ধ।

মনুষ্যের প্রকৃতির মধ্যেই দেবতা ও অসুর বর্ত্তমান। মানবের অন্তরেই দেবাসুরে মহাযুদ্ধ নিয়ত চলিতেছে। কখনও দেবতার জয়; কখনও অসুরের জয়। দেবতার জয়ে পুণ্য ও পবিত্রতা; অসুরের জয়ে পাপের উৎপত্তি। এই মহাযুদ্ধে যখন দেবতা চিরজয়ী হন, তখনই অমৃতলাভ।

যুদ্ধ করাই আমাদের কাজ। সুখশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার জন্য আমরা সংসারে আসি নাই। সর্ব্বদাই জাগ্রত, সর্ব্বদাই যুদ্ধবেশে থাকিতে হইবে। পরমেশ্বরের সৈন্যগণ! নিয়ত সতর্ক হইয়া অনলোপম স্বর্গীয় সাহসের সহিত অন্তরে বাহিরে পরাক্রান্ত শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ কর। ভয় করিও না, বিচলিত হইও না। স্বয়ং বিশ্বরাজ অভয় দান করিতেছেন! যদি অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত অহোরাত্র যুদ্ধ করিতে পার, পরিণামে জয় নিশ্চিত। যাহারা আরাম চায়, আয়েস চায়, এ মহাযুদ্ধে জয়ী হওয়া তাহাদের কর্ম্ম নহে। সুখপ্রিয় লোক আপনাদের নীচ লক্ষ্য লইয়া হীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিবে। কিন্তু যাঁহারা এই মহা ধর্ম্ম-যুদ্ধে জয়ী হইয়া জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে চান, তাঁহারা সুখ ও দুঃখ উভয়কেই অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বশক্তিমানের নাম লইয়া নিয়ত জাগ্রত, নিয়ত কার্য্যতৎপর, নিয়ত শত্রুবিনাশে অগ্রসর থাকিবেন। দুঃখ হয় হউক, সুখ আসে আসুক, কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করিবেন না। সুখ দুঃখ নিরপেক্ষ হইয়া আপনার কার্য্য আপনি সাধন করিবেন।

নীচ ভীরু অবিশ্বাসী ভয় পাইয়া ফিরিয়া আসে। হতাশ

হইবে কেন? বিশ্বাস কর যে, যে ব্যক্তি এই মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, পরমেশ্বর তাঁহার অন্তরে এমন শক্তি প্রেরণ করেন যে, পরিণামে শত্রুগণ তাহার নিকট নিশ্চয়ই পরাভূত হয়। তিনি যখন বলিতেছেন, যুদ্ধ কর, তখন জয়ী হইবার উপযুক্ত শক্তি তিনি অবশ্যই দিবেন। শত বার পরাস্ত হইলেও, আবার বদ্ধ-পরিকর হও; শতবার পতিত হইলেও, আবার বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান্ হও; কিছুতেই ছাড়িও না। ছাড়িলেই সর্ব্বনাশ! কখনই বলিবে না, পারিব না। কখনই পরাজয় স্বীকার করিবে না; পরাজয় স্বীকার করিলেই শত্রুর কারাগারে বন্দী হইতে হইবে।

স্বাধীনশক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুগত হয় না কেন?

মনুষ্যের স্বাধীন শক্তি কেন সর্ব্বদাই ধর্ম্মের অনুগত হইয়া কার্য্য করে না? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। মানুষ দুর্ব্বল, অপূর্ণ। তাহার অন্তরে ও বাহিরে যে সকল শত্রু রহিয়াছে;—যে সকল প্রতিকূল অবস্থা রহিয়াছে,—তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া সকল সময়েই অটল থাকা কখন সম্ভব নহে। বিশ্বপিতা আমা-দিগকে তাঁহার দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও বীর সন্তান করিতে চান; প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করি, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। ইহাতে কষ্ট আছে, যন্ত্রণা আছে। কিন্তু তিনি আমাদের সুখ তত চাহেন না, যত ধর্ম্ম চান। প্রকৃত ধর্ম্ম, ভীরু কাপুরুষের জন্য নহে। দুঃখ হয় হউক; সর্ব্ববিধ দুঃখকে পরাস্ত করিয়া দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া আমরা ধর্ম্মলাভ করি, ইহাই তাঁহার বিধান। তিনি বাঙ্গালী মাতার ন্যায় নহেন। তিনি জগতের মা, সত্য; কিন্তু

'বাঙ্গালী মা' নহেন। পরমেশ্বর প্রাচীন স্পার্টা দেশীয় মাতার ন্যায়। শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া আসিলে মাতার নিকটে সেই ভীরু সন্তানের আদর নাই।

মানুষ আপনার স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া পশুপ্রবৃত্তির দাসত্বে নিযুক্ত হয়। স্বাধীনতার অপব্যবহারে প্রকৃত স্বাধীনতা হারায়। ধর্ম্মের অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। অবশীভূত দুষ্ট অশ্বের ন্যায় প্রবৃত্তি সকল সর্ব্বদা মনুষ্যকে বিপথে চালিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত করে।

পাপ অভাবপদার্থ।

আবার সেই প্রশ্ন; পাপ কোথা হইতে আসিল? পাপ কোথা হইতে আসিল? এরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না। পাপ যদি কোন বাস্তব পদার্থ হইত, যদি উহার বাস্তব সত্তা থাকিত, তাহা হইলে পাপ কোথা হইতে আসিল? কেমন করিয়া আসিল? কে উহার সৃষ্টি করিল? ইত্যাদি প্রশ্ন সুসঙ্গত হইত। পাপের সত্তা নাই। পাপ অভাব পদার্থ। এই সম্মুখস্থ বৃক্ষের যেমন বাস্তব সত্তা আছে, পাপের সেরূপ কোন সত্তা নাই। মানবদেহের কোন অঙ্গ, কোন প্রত্যঙ্গ পাপ নহে, মনের একটীও বৃত্তি পাপ নহে। সকলই পবিত্রস্বরূপ, পরমেশ্বরের সৃষ্ট, সকলই পবিত্র। তাঁহার হস্ত হইতে যাহা আসিয়াছে, তাহা কখনও পাপময় অপবিত্র হইতে পারে না। অন্তর্জ্জগতে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা রহিয়াছে; ইহাদের বাস্তব সত্তা আছে। বহির্জ্জগতে আকৃতি, বিস্তৃতি প্রভৃতি গুণসম্পন্ন অগণ্য অসংখ্য পদার্থ রহিয়াছে; তাহাদের সত্তা আছে। কিন্তু পাপ কি সেইরূপ কোন পদার্থ? পাপের কি সেইরূপ সত্তা আছে? কখন না। জ্ঞানের অভাব

অজ্ঞান, আলোকের অভাব অন্ধকার, ধনের অভাব দরিদ্রতা, সেইরূপ পুণ্যের অভাবের নাম পাপ।

যে রূপেই কেন পাপের লক্ষণা কর না, পাপ যে অভাব পদার্থ, তাহা নিশ্চয়ই প্রকাশ হইবে। পরমেশ্বরের ধর্ম্মনিয়ম (Moral Law) প্রতিপালন না করা; অথবা উহা অতিক্রম বা ভঙ্গ করা; বিবেকের আদেশ অগ্রাহ্য করা, উহা পালন না করা, পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে কার্য্য না করা—ইত্যাদি যত প্রকারেই কেন পাপের লক্ষণা করিতে চেষ্টা কর না, পাপ যে অভাবাত্মক পদার্থ সকল লক্ষণাতেই তাহা প্রকাশ পাইবে। ধর্ম্ম, পুণ্য, পরমেশ্বরের ইচ্ছা, এ সকলেরই বাস্তব সত্তা আস্তিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। পাপ কি? ধর্ম্ম, পুণ্য, পরমেশ্বরের ইচ্ছা এই সকলকে উল্লঙ্ঘন করা, ভঙ্গ করা, তদনুসারে কার্য্য না করা। পাপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে যাহাই কেন বল না, উহাতে একটা না আসিয়া পড়িবে। না ভিন্ন পাপ আর কিছুই নহে। ধর্ম্ম না মানা, ধর্ম্ম না করা, ধর্ম্মের অপলাপ করা ইহাই পাপ। সুতরাং পাপ সর্ব্বথাই অভাব পদার্থ; পাপ নিজে একটা পদার্থ নহে। পাপ যদি কোন পদার্থ না হইল, যদি উহার বাস্তব সত্তা না থাকিল, তাহা হইলে পাপ কোথা হইতে আসিল, কে পাপ সৃষ্টি করিল, এ প্রশ্ন কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে?

ইচ্ছাশক্তি ও পাপ।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, পাপ যদি কোন পদার্থ না হয়, যদি উহার বাস্তব সত্তা না থাকে, তবে পাপের জন্য আমাদের এত ভাবনা কেন? তবে উহার জন্য ক্রন্দন করি কেন?

পাপের বাস্তব সত্তা না থাকিলেও উহার সহিত আমাদের ইচ্ছা-শক্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমরা ইচ্ছা করিয়া পাপ করি। আমাদের ইচ্ছা অভাব পদার্থ নহে। উহার বাস্তব সত্তা আছে। সুতরাং পাপ অভাব পদার্থ হইলেও, উহা কিছুই না, এরূপ বলা যায় না। পাপ স্বভাবতঃ অভাব পদার্থ হইলেও লোকে যে উহার বাস্তব সত্তা আছে বলিয়া মনে করে, তাহার কারণ ইচ্ছা-শক্তি। ইচ্ছা-শক্তির বাস্তব সত্তা আছে; ইচ্ছা-শক্তি অভাব পদার্থ নহে। ঐ ইচ্ছা-শক্তির দ্বারাই মনুষ্য পাপ করে। সুতরাং অভিনিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া না দেখিলে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, পাপের বাস্তব সত্তা আছে।

ইচ্ছা-শক্তি পাপের মূল। ইচ্ছা-শক্তি হইতেই পপের উৎপত্তি, অথচ পাপ অভাব পদার্থ। ঐ প্রদীপটি জ্বলিতেছে। আমি ইচ্ছা করিলাম, উহা নির্ব্বাণ করিয়া দিব; তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ করিয়া দিলাম। এস্থলে আমার ইচ্ছার বাস্তব সত্তা আছে। ঐ ইচ্ছা হইতে একটী কার্য্য হইল; কার্য্যটি অভাবাত্মক। প্রদীপ জ্বলিতেছিল, উহা নির্ব্বাণ করিলাম। একটা বাস্তব পদার্থ ছিল, উহার বিলোপসাধন করিলাম। পাপ-কার্য্যও অবিকল সেইরূপ। ধর্ম্মের বা পুণ্যের অপলাপ করার নামই পাপ। সুতরাং বাস্তব সত্তাবিশিষ্ট ইচ্ছা-শক্তির সহিত মূলে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিলেও, পাপ সর্ব্বদাই অসৎ, সত্তাবিহীন পদার্থ; অভাব পদার্থ। পাপ যে অভাব পদার্থ, ইহা ভারত-বর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যগণ সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা পাপকে অসৎ এবং পুণ্যকে সৎ বলিয়াছেন।

এখন কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, মনুষ্যের ইচ্ছাতেই

যখন পাপ, তখন পাপকে অভাব অদার্থ কেন বলিব? ইচ্ছা-শক্তির বাস্তব সত্তা আছে; ইচ্ছা-শক্তি যখন পাপময় হইল, তখন পাপেরও বাস্তব সত্তা কেন স্বীকার করিব না? ইচ্ছাশক্তি কখন পাপময় নহে। ইচ্ছা-শক্তি পরমেশ্বরপ্রদত্ত পবিত্র শক্তি। ইচ্ছা-শক্তি আছে বলিয়াই মনুষ্য জ্ঞান, ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছে। ইচ্ছাশক্তির জন্যই জ্ঞান ধর্ম্ম সম্ভব হইয়াছে। ঐ ছুরিকা-খানিদ্বারা লেখনী প্রস্তুত করিয়া পরমার্থতত্ত্ব লিখিতে পার, ফল কাটিয়া ক্ষুধার্ত্তের সেবা করিতে পার, অথবা উহা কোন নির্দ্দোষীর কণ্ঠে বিদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে পার। ছুরিকাতে পাপ পুণ্য কিছুই নাই। পাপ পুণ্য পরমেশ্বরের ধর্ম্ম-নিয়ম পালনে বা উল্লঙ্ঘনে। ইচ্ছা-শক্তি ঐ ছুরিকার ন্যায়। উহাকে যে কোন কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পার। উহা স্বভাবতঃ পাপময় নহে। ইচ্ছা-শক্তিদ্বারা যখন আমরা পরমেশ্বরের আদেশ অতিক্রম করি, যখন তাঁহার ধর্ম্মনিয়ম পালন না করি, তখনই পাপের উৎপত্তি। সুতরাং ইচ্ছা-শক্তি বাস্তব সত্তা-বিশিষ্ট পদার্থ হইলেও, পাপ নিশ্চয়ই অভাব পদার্থ। ইচ্ছা-শক্তি পাপময় নহে। উহা আছে বলিয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হইয়াছে।

বিবেক ও পাপ।

মানবাত্মা স্বাধীন, এবং পাপ অভাব পদার্থ, এই দুটী বিষয় সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেই যে, পাপপুণ্যের তত্ত্ব বুঝা হয়, এরূপ নহে। বিবেকতত্ত্ব না বুঝিলে পাপ পুণ্যের তত্ত্ব প্রকৃতরূপে বুঝা যায় না। দায়ীত্ববোধ বিবেকের স্বরূপলক্ষণ। দায়ীত্ব-বোধ পাপপুণ্যের মূলে স্থিতি করিতেছে। নৈতিক দায়ীত্ব মানবাত্মার একটী নৈতিক ভাব। উহা বিবেকের বাণী। বিবেক

সর্ব্বদাই আদেশ করিতেছে, ইহা কর, উহা করিওনা ; এই পথে চল, ঐ পথে চলিও না। বিবেকের আদেশ পালন করিলে, আত্মপ্রসাদের উদয় হয়। আদেশ অগ্রাহ্য করিলে আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হয়। বিবেক তখন বিরক্ত অভিভাবকের ন্যায়, গুরুর ন্যায় তিরস্কার করিতে থাকে ;—ছি ! ছি ! এমন কাজ করিলে ! বিবেক নিয়তই মনুষ্যকে আদেশ করিতেছে, এবং আদেশ অতিক্রম করিলেই তিরস্কার করিতেছে। উহা অনেক সময় মানুষকে খাইতে শুইতে দেয় না। উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জন আমার জন্য প্রস্তুত, আমি বলি, আহার করিব, বিবেক বলিল, না, ঐ দুঃখী নিরাশ্রয় ব্যক্তি, তিন দিন অনাহারে আছে, উহাকে আপনার মুখের গ্রাস ধরিয়া দাও। ফিলিপ্ সিড্‌নি মৃত্যুশয্যায় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া শীতল জল পান করিতে যাইতেছেন, বিবেক বলিল, তোমার অপেক্ষা ঐ দুঃখী সৈনিকের ক্লেশ অধিক; তোমার শীতল জলপাত্র উহাকে অর্পণ কর। আমি সুখশয্যায় শয়ন করিয়া আছি, বিবেক বলিল, শয়ন করিও না, তোমার অমুক আত্মীয় রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন, তথায় গিয়া তাঁহার সেবা কর। এইরূপে বিবেক সর্ব্বদাই মনুষ্যকে প্রভুর ন্যায়, পিতার ন্যায়, অভিভাবকের ন্যায়, শিক্ষকের ন্যায়, উপদেশ ও আদেশ করিতেছে, এবং তাহা অতিক্রম করিলে তিরস্কার করিতেছে। এই বিবেকের বাণী পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ।

বিবেকের আদেশ সুস্পষ্ট অনুভূত হইলে, বিবেকের স্বরূপ বিশদরূপে বুঝিতে পারিলে, সাধক পবিত্রস্বরূপ ন্যায়বান পরমেশ্বরকে দেখিতে পান। জ্ঞানের পথ দিয়া 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ; প্রেম ভক্তির পথ দিয়া সুন্দর মধুর প্রেমময় হরি ;

বিবেকের পথ দিয়া ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বরের সহিত সাধক সাক্ষাৎ করেন।

পাপ যে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ, বিবেকের আদেশ উল্লঙ্ঘনে যে কি কালকূট গরল উৎপন্ন হয়, মানুষ তাহা বুঝে না। বুঝে না বলিয়াই তাহার এত দুর্গতি। এক ব্যক্তি মাতৃহত্যা করিল। তৎপরে, তাহার অত্যাচরিত বিবেক বলীয়ান হইল। অবমানিত, উত্তেজিত বিবেক যে কি ভীষণ পদার্থ, তাহা যে একবার প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছে, সেই জানে, অন্যে কি জানিবে? নরকাগ্নি আর কোথায়? পাপের যন্ত্রণাই নরকাগ্নি! সে যন্ত্রণার তুলনায় যারপরনাই শারীরিক ক্লেশ কিছুই নয়! পৃথিবীর জল হত্যাকারীর হস্তলগ্নশোণিত ধৌত করিয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে নরকাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, সমুদয় মহাসাগরের জলেও তাহা নির্ব্বাণ হইবার নহে! অনুতপ্ত পাপী দেখে যে, তাহার জন্য ত্রিভুবনে এক অঙ্গুলিপ্রমাণ শান্তির স্থান নাই! ভীষণ পিশাচমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার অনুষ্ঠিত মহাপাতক তাহাকে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে! যন্ত্রণা! যন্ত্রণা! যন্ত্রণা!!

মাতৃহত্যা দূরের কথা। মাতৃদ্বেষ, মাতৃবিরোধ মহাপাতক। মাতৃভক্তি পরমধর্ম্ম। মাতৃআজ্ঞা পালন পরম ধর্ম্ম। পাপ মাত্রেই মাতার প্রতি অবজ্ঞা; মাতার অবাধ্যতা। যিনি মাতার মাতা, জগতের মাতা, মাতার মাতৃত্ব, তাঁহার অবমাননা, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনই পাপ। তাঁহার প্রতি অনুরাগ, ভক্তি, তাঁহার আজ্ঞা পালনই ধর্ম্ম। সেই পরম মাতার সহিত মনুষ্যের নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধের গুরুত্ব ক্রমে ক্রমে যতই অনুভূত

হয়, পাপপুণ্যের প্রকৃতভাব ততই হৃদগত হইতে থাকে। পাপ কি ভয়ঙ্কর পদার্থ !! ধর্ম্ম কেমন মধুময় !! "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ।"

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পাপ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? সকল দেশে, সকল যুগে, সকল সম্প্রদায়ে ধর্ম্মার্থীদিগের ইহা হৃদগত প্রশ্ন। দেশ, কাল, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে মুমুক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পাপ হইতে কেমন করিয়া উদ্ধার পাইব? ইহা ধর্ম্মজগতের সার্ব্বভৌমিক জিজ্ঞাসা।

পাপ বিষয়ে যাহার যেমন সংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও তদনুরূপ।

পাপ সম্বন্ধে যাহার যেমন মত বা জ্ঞান, পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধেও তাহার মত বা জ্ঞান তদনুরূপ হইবে। যিনি পাপকে আন্তরিক পদার্থ, আত্মার অবস্থা বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহার প্রায়শ্চিত্তও আন্তরিক, আত্মার একটি অবস্থা। যাহার পাপ শারীরিক ও বাহ্যিক তাহার প্রায়শ্চিত্তও শারীরিক ও বাহ্যিক হইবে।

প্রচলিত উপধর্ম্ম বলিতেছে, ছয় কাহন কপর্দ্দক উৎসর্গ কর, তোমার পাপ চলিয়া যাইবে। ভাগীরথী সলিলে অবগাহন কর, তোমার পাপ বিধৌত হইয়া যাইবে। অন্তরের মলিনতা যেমন তেমনি থাকিল, বাহিরে কপর্দ্দক উৎসর্গ করিয়া মনে করিলাম পাপ গেল, ইহাতে কি প্রায়শ্চিত্ত হয়? শতবার কপর্দ্দক

উৎসর্গ কর, কিন্তু যদি প্রাণের অপবিত্রতা যেমন তেমনি থাকে, সে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা মাত্র। সহস্র বার ভাগীরথী সলিলে অবগাহন কর, হৃদয়ের মলিনতা, পাপপ্রবৃত্তির প্রবলতা যদি সমভাবেই থাকে, তাহাতে তোমার কিছুই হইল না। পাপ আত্মার গূঢ় স্থানে; বাহিরে উহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করা, অন্ধের মৃগয়ামাত্র।

প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম বলিতেছে, তোমার পাপের জন্য প্রভু যিশুখৃষ্ট প্রাণ দিয়াছেন,—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে; তাঁহাতে বিশ্বাস কর। পাপ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান থাকিলে, লোকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না; আপনার পাপের ভার অন্যের স্কন্ধে চাপাইতে পারে না।

অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পাপ অন্তরে। প্রায়শ্চিত্তও অন্তরে হওয়া চাই। ব্রাহ্ম-সমাজ বহুদিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন, “অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।” এ কথায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ বড় বিরক্ত। তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে কয়েকটী আপত্তি উপস্থিত করেন। একটি একটি করিয়া আপত্তি গুলির সমালোচনা করা যাউক।

অনুতাপ, সহজ প্রায়শ্চিত্ত নহে।

প্রথমতঃ তাঁহারা বলেন, অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিলে পাপী প্রশ্রয় পায়। পাপ করিবে, অনুতাপ করিবে; আবার পাপ করিবে, আবার অনুতাপ করিবে; আবার পাপ করিবে, আবার অনুতাপ করিবে; এরূপ হইলে পাপ করিতে আর ভয় থাকে না। পাপ একটা সামান্য ব্যাপার হইয়া যায়।

পাপ করিয়া অনুতাপ করিলেই যদি পাপ যায়, তাহা হইলে যতবার ইচ্ছা পাপ করিব ও তজ্জন্য অনুতাপ করিব। পাপের জন্য ভয় কি?

এমন কথা যাঁহারা বলেন, অনুতাপ কাহাকে বলে, তাঁহারা জানেন না। পাপের জন্য অনুতাপের যে কি অসহ্য যাতনা, তাহা যে জানে, সে কখনও এমন কথা বলিবে না। অনেকে মনে করেন, শারীরিক যন্ত্রণা অপেক্ষা ভয়ানক যন্ত্রনা আর নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় সত্য যে, মনের যন্ত্রণার তুলনায় শরীরের যন্ত্রণা কিছুই নহে। মনের যন্ত্রণায় মানুষ আত্মহত্যারূপ ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; কোন প্রকার শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই মনে করে না। পুত্রশোকে যাহার প্রাণ কাতর, সহস্র প্রকার শারীরিক কষ্টকে সে অগ্রাহ্য করে।

আমার নিবাসগ্রামের একজন ভদ্রলোক উন্মত্তাবস্থায় মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর তাঁহাকে ক্ষিপ্তা-শ্রমে রাখা হইয়াছিল। তথায় একদিবস রাত্রিকালে হঠাৎ তাঁহার জ্ঞান হইল, তাঁহার সহজ অবস্থা হইল। তখন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আপনার নিকটবর্ত্তী প্রজ্জ্বলিত অনল রাশির নিকট গিয়া উহাতে আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। হস্তের মাংস সকল দগ্ধ হইয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় একজন প্রহরী দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া বলিল ও পাগ্‌লা, কি করিতেছিস্; হাত পোড়াইতেছিস্ কেন"? পাগল ত আর তখন পাগল নাই, তিনি উত্তর করিলেন, এই হাতেই ত মাতৃহত্যা করিয়াছি!

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, মনের যন্ত্রণার তুলনায় শরীরের যন্ত্রণা কিছুই নয়। মনের যন্ত্রণার তুল্য যন্ত্রণা আর নাই। এই কথাটি যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহারাই বলেন যে, অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিলে পাপী প্রশ্রয় পাইবে। পাপের জন্য অকৃত্রিম অনুশোচনা যে কি ভয়ঙ্কর, তাহা যে জানে, সেই জানে, অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। যিনি আপনার পাপভার অন্যের স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তাঁহার বুঝিবার সাধ্য নাই। যখন অনুতাপানলে মানবহৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ হইতে থাকে, সেই অসহ্য যাতনা, সেই ভীষণ নরকের বর্ণনা করিতে জগতের মহা কবিগণ পরাস্ত।

পাপের দণ্ড ও অনুতাপ।

দ্বিতীয়তঃ আর একটি আপত্তি এই যে, অনুতাপ যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল, তবে পাপের দণ্ড হইল কই? আপনি পাপ করিলাম, আপনি অনুতাপ করিলাম; পাপ করিলে যে দণ্ড-ভোগ করিতে হয়, সে মত কোথায় থাকিল?

লৌকিক দণ্ড দেখিয়া অনেক লোকের মনে পাপের দণ্ড বিষয়ে লৌকিক ভাব রহিয়াছে। ঘটী চুরি করিলে পঁচিশ বেত। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ছয় মাস জেল। দুষ্কর্ম্মের এই প্রকার বাহিক ও শারীরিক শাস্তি ক্রমাগত দেখিয়া লোকে মনে করে যে বিধাতাপ্রদত্ত পাপের শাস্তিও তদনুরূপ। পাপী কুম্ভীপাক নরকে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, শকুনি আসিয়া তাহার চক্ষু খুলিয়া খাইতেছে, ভীষণমূর্ত্তি যমদুত আসিয়া তাহার মাথায় লোহার ডাঙ্গস মারিতেছে, তরলাগ্নিস্রোতে পাপী চিরদিন অবর্ণনীয় যন্ত্রণা

ভোগ করিতেছে, পাপের শাস্তি বিষয়ে যাহাদিগের এই প্রকার বিশ্বাস, তাহারা পাপের আধ্যাত্মিক শাস্তির বিষয় কেমন করিয়া বুঝিবে? অনুতাপই যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত, কেমন করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবে?

পাপ ও পাপের শাস্তির মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ।

পরমেশ্বর কার্য্যকারণসম্বন্ধে নিবদ্ধ করিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত করিতেছেন। বহির্জগৎ কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ। অন্তর্জগতেও কার্য্যকারণশৃঙ্খল। অগ্নির সহিত হস্তের সংস্পর্শ হইলে হস্ত দগ্ধ হয়; বিষপান করিলে শরীর নষ্ট হয় ইত্যাদি ঘটনা যেমন কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ, পাপ করিলে যে দণ্ডভোগ করিতে হয়, তাহাও তদনুরূপ। অগ্নির সহিত হস্তের সংস্পর্শ হইলে যে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা অন্য কোথা হইতে আসে না, সেই কার্য্যের মধ্যেই উহা স্বভাবতঃ রহিয়াছে। বিষপান করিলে যে শরীর নাশ হয়, তাহাও বাহির হইতে কেহ করিয়া দেয় না, ঐ কর্ম্মেতেই কর্ম্মফল স্বভাবতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। কর্ম্ম ও কর্ম্মফল স্বভাবতঃ একত্রে স্থিতি করিতেছে। বিষের মধ্যে বিনাশশক্তির ন্যায়, ঔষধের মধ্যে আরোগ্যশক্তির ন্যায়, কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মফল স্বভাবতঃ বর্ত্তমান। জীব আপনার কর্ম্মফল, আপনি স্বভাবতঃ ভোগ করে। ঘটী চুরির ফল পাঁচিশ বেতের ন্যায় কেহ উহা বাহির হইতে প্রেরণ করে না।

সেইরূপ পাপের শাস্তি পাপের ভিতরেই রহিয়াছে। পাপই পাপের শাস্তি ইহা অতি সত্য কথা। বাহির হইতে শাস্তি আসে না। এমন বলিতেছি না যে, পাপানুষ্ঠান জন্য মনুষ্যকে কোন প্রকার বাহ্যিক কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। সর্ব্বদাই দেখা

যায় যে, মনুষ্যকে পাপানুষ্ঠান নিবন্ধন অনেক প্রকার শারীরিক ও সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাহা পাপের আসল কষ্ট নহে। আসল কষ্ট অন্তরে। পাপ যেমন অন্তরে, পাপের জন্য প্রকৃত যন্ত্রণাও সেইরূপ অন্তরে।

ন্যায় ও দয়ার সামঞ্জস্য।

যে সকল খৃষ্টাশ্রিত ভ্রাতৃগণ উপরি উক্ত আপত্তি উপস্থিত করেন, তাঁহারা তাঁহাদের কথাটা বিশেষ করিয়া এইরূপ বলেন, —পরমেশ্বরের অনন্ত ন্যায় ও অনন্ত দয়া। তাঁহার অনন্ত ন্যায় বলি-তেছে, পাপী দণ্ডভোগ করুক্। তাঁহার অনন্ত দয়া বলিতেছে, পাপ-যন্ত্রণা হইতে পাপী পরিত্রাণ লাভ করুক্, পাপের ক্ষমা হউক। অনন্ত ন্যায় পাপের শাস্তি চায়, অনন্ত দয়া পাপীর পরিত্রাণ চায়। এই উভয়ের সামঞ্জস্য কেমন করিয়া হইবে? ন্যায় রক্ষা হইলে দয়া থাকে না, দয়ার কার্য্য হইলে ন্যায় থাকে না। পরমেশ্বরের স্বরূপের এই উভয় গুণই কেমন করিয়া রক্ষা পায়?

এই সমস্যার মীমাংসা কি? একদিকে ন্যায় মাথা তুলিয়া বলিল, পাপীকে শাস্তি দাও। অপর দিকে দয়া বলিল, পাপীকে রক্ষা কর। এই উভয়ের কথাই কেমন করিয়া রক্ষিত হইবে? ন্যায় ও দয়ার বিপরীত আদেশ পরস্পর প্রতিহত হইয়া কি উভ-য়েই নষ্ট হইয়া যাইবে? সমশক্তি বিশিষ্ট দুইয়ের প্রতিঘাতে কি কোনটারই কার্য্য হইবে না? পাপী যেমন ছিল, তেমনি থাকিবে?

না, তাহা নহে। প্রকৃততত্ত্ব যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ন্যায় ও দয়া পরস্পর বিরোধী নহে। ন্যায়ের আদেশ ও দয়ার আদেশ একই স্থান হইতে, একই পথে, একই উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। পরমেশ্বর পাপীকে যে দণ্ডবিধান করেন, তাহার

মধ্যে ন্যায় ও দয়া নির্ব্বিবাদে, সমঞ্জসীভূতরূপে অবস্থিতি করে। তাঁহার দণ্ডেতেই ন্যায়, তাঁহার দণ্ডেতেই দয়া চিরদিন একত্রে বাস করিতেছে।

পিতামাতা যখন সন্তানকে শাসন করেন, অপরাধের জন্য উপযুক্ত দণ্ড বিধান করেন,তখন তাহাতে ন্যায় প্রকাশ পায়, না, দয়া প্রকাশ পায়? অপরাধের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়, সুতরাং নিশ্চয়ই ন্যায় রক্ষিত হয়; কিন্তু তাহাতে দয়া বা প্রেম কি প্রকাশ পায় না? নিশ্চয়ই পায়। সন্তান অপরাধ করিলে পিতামাতা দণ্ড বিধান করেন কেন? প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য? সন্তানের কল্যাণের জন্যই পিতামাতা সন্তানকে শাস্তি দেন। সন্তান ভাল হউক, অন্যায় কার্য্যে তাহার প্রবৃত্তি নষ্ট হউক, উন্নতিপথে সে অগ্রসর হউক, এই শুভ কামনাতেই পিতামাতা অপরাধের জন্য সন্তানের দণ্ড বিধান করেন। সন্তানের ভাল চান, সেই জন্যই সন্তানকে শাস্তি দেন।

পিতামাতা যে সন্তানকে শাস্তি দেন তাহার মূলে পিতৃমাতৃ-স্নেহ। ত্যজ্য পুত্রকে কোন্ পিতা শাস্তি দিতে যান। যে পিতামাতার হৃদয় হইতে চলিয়া গেল, তাহার আর শাস্তি পাই-বার অধিকার থাকিল না। আপনার ছেলেকে লোকে শাস্তি দেয়, কেননা তাহার মঙ্গল চায়। পরের ছেলে দোষ করিলে তাহার জন্য কেহ তেমন চিন্তা করে না, কেননা নিজের সন্তা-নের প্রতি যেমন স্নেহ হয়, এমন আর কোথাও নহে।

এখন দেখ পিতামাতা সন্তানকে যে শাস্তি দেন তাহাতে ন্যায় এবং দয়া উভয়ই প্রকাশ পায়। অপরাধের জন্য উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতেছেন, সুতরাং ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। কল্যাণের জন্য

দণ্ডবিধান করিতেছেন, সুতরাং দয়া প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষরূপে দয়া বা প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। কেননা সন্তান-বাৎসল্য না থাকিলে কেহ সন্তানকে শাস্তি দেয় না। অন্যের পুত্রকে কেহ শাস্তি দেয় না। যাহার প্রতি আমি উদাসীন তাহার অপরাধ দেখিয়া শাস্তি দান করিব কেন?

পিতামাতা সম্বন্ধে যেমন, শিক্ষক সম্বন্ধেও সেইরূপ। শিক্ষক ছাত্রকে শাস্তি দেন কেন? প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য? ছাত্র যাহাতে বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হয়, তজ্জন্যই তাহাকে শাস্তি দেন। অপরাধের জন্য শাস্তি দেন, সুতরাং ন্যায় রক্ষা পায় এবং কল্যাণের জন্য শাস্তি দেন সুতরাং উহাতে দয়া প্রকাশ পায়।

পিতামাতা এবং শিক্ষকপ্রদত্ত শাস্তি সম্বন্ধে যেমন, রাজদণ্ড সম্বন্ধেও সেইরূপ, অথবা সেইরূপ হওয়া উচিত। এক্ষণে অল্প-বয়স্ক অপরাধীদিগের জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন কোন স্থানে সংশোধ-নালয় (Reformatory) সংস্থাপন করিয়াছেন। উহাতে শাস্তি এবং শিক্ষা একত্রে হইতেছে। ন্যায় ও দয়ার কার্য্য একত্র হইতেছে। অল্পবয়স্কদিগের জন্য যেমন, প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী-দিগের জন্যও সেইরূপ হওয়া উচিত। ইহা সুসভ্য জগতের অনেক চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত। ক্রমে ক্রমে কারা-গৃহের কার্য্য প্রণালী যেরূপ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইতেছে, অপরাধীদিগকে প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে আশা হয় যে, সত্বরে প্রার্থিত সংস্কার সুসম্পন্ন হইবে। কতক পরিমাণে এখনই কোন কোন দেশে তদনুরূপ কার্য্য হইতেছে।

পরমেশ্বর-প্রেরিত শাস্তি পাপীর পক্ষে মহৌষধ। উহাতে সে উৎকট পাপরোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। তিক্ত মহৌ-

ঔষধ পানের স্থায়, মহৌষধস্বরূপ তাঁহার প্রেরিত শাস্তি অবনত মস্তকে গ্রহণ কর। আগ্রহের সহিত তাঁহার স্থায়দণ্ডকে চুম্বন কর। অনন্ত স্নেহ, ভীষণ স্থায়দণ্ডরূপে তোমার মস্তকে আসিয়া পড়িতেছে, হে পাপি! ভয় করিও না, উহাকে চুম্বন কর। ঐ ভয়ঙ্কর বজ্রনিনাদ এবং প্রাণশীতলকর জলধারা, একই জলধর হইতে আসিতেছে। ভয় করিব কেন? "দেও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়, খণ্ড খণ্ড কর এ পাপহৃদয়, তোমার হাতে ম'লে এ মহাপাতকী, নবজীবন পাবে।"

স্থায়, ক্ষমা ও দয়া।

অপরাধীকে দণ্ড দিলে ক্ষমা থাকে না, না দিলে স্থায় থাকে না। অনেক খৃষ্টিয়ানেরা মনে করেন, তাঁহাদের এই যুক্তি অখণ্ডনীয়। ক্ষমা অর্থ কি? পরমেশ্বরের অনন্ত ক্ষমা, কেন-না তাঁহার সকলই অনন্ত। তিনি অনন্তস্বরূপ। তবে দণ্ড দিলে ক্ষমা থাকে কই? অন্ততঃ অনন্ত ক্ষমা থাকে কই?

ক্ষমা অর্থ কি? যদি বল ক্ষমা অর্থে উচিত দণ্ড না দেওয়া, তবে পরমেশ্বরের সে ক্ষমা আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। তিনি স্থায়বান্, তাঁহার অখণ্ডনীয় স্থায়দণ্ড। আবার জিজ্ঞাসা করি, ক্ষমার প্রকৃত অর্থ কি? তুমি আমাকে ভালবাস। আমি তোমার নিকটে অপরাধী হইলাম। তথাচ তোমার ভালবাসা গেল না। অথবা অপরাধের জন্ম তুমি আমার প্রতি বিমুখ হইলে। কিন্তু আমাকে অনুতপ্ত দেখিয়া আবার প্রসন্ন হইলে; অর্থাৎ ক্ষমা করিলে। যে ব্যক্তি অপরাধ দেখিয়াও অপরাধীকে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দেয় না, সেই প্রকৃত ক্ষমাশীল।

কোন ব্যক্তির নিকটে আমি অপরাধী হইলাম; তিনি আমার

প্রতি বিমুখ হইলেন। আবার যখন আমার প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব ভাব আসিল, তথনই তিনি আমাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু এমন যদি কেহ থাকেন, আমি সহস্র অপরাধ করিলেও আমার প্রতি যাঁহার প্রেম বিচলিত হইবার নহে, তিনি আমাকে তিরস্কার করুন, অথবা শারীরিক বা অন্যবিধ দণ্ডবিধান করুন, আমার প্রতি তাঁহার ক্ষমার সীমা দেখিতে পাই না।

ন্যায়, প্রেম ও ক্ষমা একত্রে থাকে। পিতা, মাতা ও সদ্‌গুরুর মধ্যে ন্যায়, প্রেম ও ক্ষমা চিরদিন সমঞ্জসীভূতরূপে একত্রে বাস করিতেছে। যিনি জগতের পিতা মাতা ও সদ্‌গুরু তাঁহার মধ্যে ন্যায় প্রেম ও ক্ষমা চিরদিন সমঞ্জসীভূতরূপে একত্রে বাস করিতেছে।

ধর্ম্মজগতের অনেক লোকের বিশ্বাস এইরূপ ;—পরমেশ্বর স্বর্গ সৃষ্টি করিলেন ; নরক সৃষ্টি করিলেন ; পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন ; পৃথিবীতে মনুষ্যকে রাখিয়া দিলেন। আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, মানুষ যদি পুণ্যবান হয়, স্বর্গে গিয়া চিরকাল বাস করিবে। যদি পাপী হয়, নরকে গিয়া চিরকাল যন্ত্রণা পাইবে। মানুষ পৃথিবীতে পরীক্ষার অবস্থায় রহিয়াছে। পরমেশ্বর পরীক্ষা করিয়া দণ্ড, পুরস্কার বিধান করিতেছেন।

আমি এমন উদাসীন পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি না। তিনি কেবল পরীক্ষা করেন না। তিনি জগতের পিতা, জগতের মাতা, জগদ্‌গুরু ; তিনি অনন্ত স্নেহে মনুষ্যকে অনন্ত মঙ্গলের দিকে লইয়া যাইতেছেন। মনুষ্যজীবন পরীক্ষার অবস্থা তত নহে, যত শিক্ষার অবস্থা। এ বিশ্ব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়। সত্য, প্রেম, মঙ্গলের অনন্ত পাঠ আমাদিগকে শিখিতে হইবে। মাতার ন্যায়, পিতার ন্যায়, সদ্‌গুরুর ন্যায়, তিনি আমাদিগকে

চিরদিন শিক্ষা দান করেন। দোষ করিলে আমাদেরই কল্যাণের জন্য শাস্তি বিধান করেন।

খৃষ্টীয় মতে ন্যায় ও দয়ার সামঞ্জস্য।

কিন্তু এ বিষয়ে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কি মত প্রচার করেন? তাঁহার মতে, ন্যায় ও দয়ার সামঞ্জস্য কি প্রকারে রক্ষা পায়? পরমেশ্বর দেখিলেন, দুই দিকই রক্ষা পায় না। দণ্ড দিলে দয়া থাকে না, দয়া করিলে ন্যায় থাকে না। সুতরাং তিনি পাপীর পরিত্রাণের জন্য একটি আশ্চর্য্য কৌশল করিলেন। তিনি তাঁহার প্রিয়পুত্র যিশুখৃষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। যিশু মানবদেহ ধারণ করিয়া, মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া, মনুষ্যলোকে কিছুকাল বাস করিলেন। মানুষের পাপ-ভার আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া তজ্জন্য ভয়ঙ্কর যন্ত্রনা ভোগ করিলেন। মানুষের পাপের শাস্তি আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। যে তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে, সেই পরিত্রাণ লাভ করিবে। ইহাতে ন্যায় ও দয়া উভয়ই রক্ষা পাইল। পাপীর পরিবর্ত্তে তিনি শাস্তিগ্রহণ করিলেন, সুতরাং ন্যায় রক্ষা পাইল; পাপী পরিত্রাণ লাভ করিল, সুতরাং দয়া প্রকাশ পাইল।

আমি বলি, কিছুই রক্ষা পাইল না। যে ব্যক্তি অপরাধী, সেই অপরাধের দণ্ডভোগ করিবে, ইহাই ন্যায়। ইহার অন্যথা হইলে ন্যায় রক্ষা পায় না। আমি ঘটী চুরী করিলাম, তুমি জেলে যাইবে কেন? তাহাতে কি ন্যায় রক্ষা পায়? রাম খুন করিল, শ্যাম ফাঁসি যাইবে কেন? তাহাতে কি ন্যায় রক্ষা পায়? 'উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে' চাপাইলে কি ন্যায় রক্ষা পায়? *

---

* খৃষ্টিয়ানেরা আপনাদের মত সমর্থন করিবার জন্য বলেন যে, যদি কোন

যিশুখৃষ্ট পাপী মনুষ্যের জন্য কষ্ট ভোগ করিলেন, ইহাতে নিশ্চয়ই ন্যায় রক্ষা পাইল না। কেননা অপরাধীর প্রাপ্য শাস্তি নিরপরাধী ভোগ করিলে অন্যায় হয়। দয়াও সম্পূর্ণ রক্ষা পাইল না। কেননা জগতে মনুষ্য সংখ্যা যত, এবং প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মানুসারে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি মুক্তিলাভের যোগ্য, তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে লক্ষের মধ্যে একজন স্বর্গে যাইতে পারে কিনা সন্দেহ। অবশিষ্ট নিরনব্বই সহস্র নয় শত নিরনব্বই জন নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে। লক্ষের মধ্যে নিরনব্বই হাজার নয় শত নিরনব্বই জন অনন্ত নরক ভোগ করিবে! ইহাতে কি দয়া রক্ষা পাইল? যদি অধিকাংশ মানুষের এই ভয়ঙ্কর পরিণাম, তবে মানুষকে সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি ছিল?

যদি প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের এই মত হইত যে, মৌখিক বা সামান্য প্রকার বিশ্বাসেই মানুষ পরিত্রাণ পাইবে, তাহা হইলে এ সকল

বিচারক কোন নিতান্ত দরিদ্র অপরাধীর অর্থদণ্ড করিয়া সেই অর্থ তাহার হইয়া আপনি প্রদান করেন, তাহাতে কি সেই নিঃসম্বল দরিদ্র বিচারালয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না? যিনি ন্যায় বিচারে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন, তিনিই দয়া করিয়া সেই অর্থ প্রদান করিলেন। সেইরূপ, যিশু নিজেই পরমেশ্বরের; তাঁহারই নিকটে আমরা ন্যায় বিচারে দণ্ডনীয়। আবার তিনিই সেই দণ্ড নিজেই গ্রহণ করিলেন, ইহা হইবে না কেন?

ইহা যারপরনাই অসার কথা। দান করিলে এক জনের অর্থ আর এক জনের হইতে পারে। কিন্তু একজন অপরাধীর অপরাধ কি কোন নিরপরাধীর হইতে পারে? একজনের চৌর্য্য, প্রতারণা, হত্যা প্রভৃতির জন্য কি কোন নির্দ্দোষীকে অপরাধী করা যায়? যদি তাহা না হয়, তবে সে পাপের দণ্ডই বা কোন্ বিচারে সে ব্যক্তি ভোগ করিবে? আর এক কথা। কোন খুনী আসামীর জন্য যদি জজ্ সাহেব ফাঁসি যান, তাহাতে কেমন ন্যায় রক্ষা পায়?

কথা বলিতাম না। মৌখিক বিশ্বাসে হইবে না, সামান্ত প্রকার বিশ্বাসে হইবে না। আন্তরিক বিশ্বাস চাই, প্রকৃত বিশ্বাস চাই। সেকি সহজ কথা?

যিশু স্বয়ং কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন;—Not every one that sayeth unto me, Lord, Lord, shall enter into the Kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

And, then, will I profess unto them, I never knew you; depart from me, ye that work iniquity. Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.

And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house: and it fell not: for it was founded upon a rock:

And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:

And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.

"যাহারা আমাকে প্রভু প্রভু করিয়া বলে, তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমত নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে। সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভো, আপনার নামে

আমরা কি ভাবোক্তি প্রচার করি নাই? ও আপনকার নামে ভূতদিগকে ছাড়াই নাই? এবং আপনকার নামে কি প্রভাবের অনেক ক্রিয়া করি নাই? তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিব, আমি তোমাদিগকে কখন জানি নাই; হে অধর্ম্মাচারিরা, আমার নিকট হইতে দূর হও। অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে আমি এমত এক বুদ্ধিমান্ লোকের সদৃশ জ্ঞান করি, যে পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল। পরে বৃষ্টি পড়িয়া বন্যা আসিয়া বায়ু বহিয়া সেই গৃহে লাগিলে তাহা পড়িল না, কারণ পাষাণের উপর তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত ছিল। আর যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়াও পালন না করে, তাহাকে এমত এক নির্ব্বোধ লোকের সদৃশ বলিতে হইবে, যে বালুকার উপরে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল। পরে বৃষ্টি পড়িয়া বন্যা আসিয়া বায়ু বহিয়া সেই গৃহে লাগিলে তাহা পড়িয়া গেল, ও তাহার ঘোরতর পতন হইল।"

নূতন বাইবেলের অন্য একস্থানে খৃষ্টের একজন শিষ্যের উক্তি শ্রবণ করুন;—**But be ye doers of the word, and not hearer only, deceiving your own selves.**

For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass * * *

*** * * * What *doth* it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? Can faith save him? * * * Even so faith if it hath not works, is dead, being alone.**

Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works: show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works.

Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble.

But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead ?

* * * * *

For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.

"কিন্তু সেই বাক্যের কর্ম্মকারী হও, আপনাদিগকে ভুলাইতে শ্রোতামাত্র হইও না।

কেননা যে কেহ বাক্যের কর্ম্মকারী না হইয়া শ্রোতামাত্র থাকে, সে দর্পণে আপনার স্বাভাবিক মুখ নিরীক্ষণকারী মনুষ্য সদৃশ।"

* * * *

"হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমার বিশ্বাস আছে, ইহা যে বলে, তাহার যদি কর্ম্ম না থাকে, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে ? সেই বিশ্বাস কি তাহার পরিত্রাণ সাধনে সমর্থ ?

* * * * *

বিশ্বাসও তদ্রূপ; কর্ম্মবিহীন হইলে আপনি একা বলিয়া সে মৃত।

যাহা হউক, লোকে বলিবে, তোমার বিশ্বাস আছে, এবং আমার কর্ম্ম আছে। তোমার কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার কর্ম্ম হইতে বিশ্বাস দেখাইব।

একই ঈশ্বর আছেন, ইহা তুমি বিশ্বাস করিতেছ; ভাল করিতেছ। ভূতেরাও তাহা বিশ্বাস করে, এবং ত্রাসে রোমাঞ্চিত হয়

কিন্তু হে নিঃসারচিত্ত মনুষ্য, কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস যে অকর্ম্মণ্য, ইহা জানিতে কি যাচ্ঞা কর ?

* * * * *

বস্তুতঃ যেমন আত্মাবিহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্ম্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।"

কি পরিমাণে বিশ্বাস লাভ করিলে, কত ভাল হইলে, পরিত্রাণের যোগ্য হওয়া যায়, তাহা কি কেহ নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে পারেন। খৃষ্টিয়ান্‌দিগের মধ্যে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, যেরূপ নিশ্চল বিশ্বাস হইলে আপনাকে পরিত্রাণ যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারি, সেরূপ বিশ্বাস আমি লাভ করিতে পারি নাই। যীশুখৃষ্টে বিশ্বাসী হইলে পরিত্রাণ হইবে স্বীকার করিলেও এই গভীর সংশয় থাকিয়া যাইতেছে যে, সেই বিশ্বাসের স্বরূপ ও পরিমাণ কি ? যেরূপ বিশ্বাস লাভ করিলে মনুষ্য পরিত্রাণ লাভ করে, সেইরূপ বিশ্বাস আমার হইয়াছে কি না, ইহা অতি গুরুতর ও গভীর প্রশ্ন। কার্য্যের দ্বারা বিশ্বাস প্রকাশ পায়, কিন্তু এ সংসারে অনেক অবিশ্বাসী বা সংশয়ীরাও ত কার্য্য করিতেছে, সুতরাং ইহাই জিজ্ঞাস্য, কেমন ভাবে কার্য্য করিলে উহা বিশ্বাসের পরিচায়ক হইবে। যেরূপ নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক ভাবে কার্য্য করিলে উহা প্রকৃত ধর্ম্মকার্য্য হয়, সেরূপ ভাবে আমি কার্য্য করিতে পারিতেছি কি না ? এই সকল গুরুতর চিন্তায় অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির চিত্ত আন্দোলিত। বাস্তবিক কথা এই, পরিত্রাণ লাভ হইয়াছে কি না, তাহা অনুমান বা কল্পনাদ্বারা বুঝিবার নহে। পরিত্রাণ আপনার অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। কিন্তু ইহসংসারে

কয়জন লোক, কয়জন খৃষ্টিয়ান্, কয়জন ধর্ম্মপ্রচারক আপনার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন, আমি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি? যদি এমন লোক কেহ থাকেন, লক্ষের মধ্যে একজন তেমন লোক পাওয়া যায় কি?

এখন দেখ। খৃষ্টীয় প্রায়শ্চিত্তপ্রণালীতে যেমন পরমেশ্বরের স্থায় রক্ষা পায় না, সেইরূপ তাঁহার দয়াও সম্পূর্ণ রক্ষা পায় না। লক্ষ্য মনুষ্যের মধ্যে একজন দয়ার পাত্র হইলে,—দয়া লাভ করিলে, অনন্ত দয়া কি কখন চরিতার্থ হইতে পারে? অন্যের স্কন্ধে পাপের বোঝা চাপাইলে, আমার ন্যায্য শাস্তি অপরে ভোগ করিলে, ন্যায় ও দয়া এতুয়ের কোনটীই রক্ষা পায় না। *

---

* আপনার পাপ ঈশ্বরকে অর্পণ করা সম্বন্ধে একটি সুন্দর পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বহু সংখ্যক জ্ঞাতিবধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের মনে গভীর বেদনা উপস্থিত হইল। জ্ঞাতিবধরূপ মহাপাতক হইয়াছে বলিয়া তাঁহার চিত্তের শান্তি থাকিল না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আপনার মনের দুঃখ জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—"মহারাজ চিন্তা করিবেন না, আপনার পাপ আমাকে অর্পণ করুন, আমি গ্রহণ করিতেছি।" যুধিষ্ঠির সম্মত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে পাপ অর্পণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন হইল। যুধিষ্ঠির প্রস্তুত হইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পাপ অর্পণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ভীম দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—মহারাজ ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন। যুধিষ্ঠির স্তম্ভিত হইলেন। ভীম নিকটে আসিয়া বলিলেন, মহারাজ কি করিতেছেন? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন কেন, আমার পাপ আমি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতেছি। ভীম বলিলেন, এমন ভয়ানক কাজ করিবেন না। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন কথা কেন বলিতেছ? ভীম উত্তর করিলেন, মহারাজ শাস্ত্রানুসারে পরমেশ্বরকে পুণ্য অর্পণ করিলে একগুণ পুণ্য শতগুণ হয়। তবে আপনার একগুণ পাপ, শতগুণ হইবে না কেন?

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মহর্ষি এ বিষয়ে কেমন সুন্দর কথা বলিয়াছেন!

এক: প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব তু দুষ্কৃতম্‌॥

একাকী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে।

অনুতাপকে প্রায়শ্চিত্ত বলা হয় কেন?

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব গভীররূপে আলোচনা করিলে, প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব পরিস্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, অনুতাপই পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। অনুতাপকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলা হয় কেন? প্রায়শ্চিত্ত কাহাকে বলে? যাহাতে চিত্ত নির্ম্মল করে। পাপ করিয়া হৃদয়কে কলঙ্কিত করিলাম, যাহাতে আবার পূর্ব্বের নির্ম্মলতা পুনঃপ্রাপ্ত হই, তাহাই প্রায়শ্চিত্ত। পাপ করিবার পূর্ব্বে মনের যে রূপ অবস্থা ছিল, যাহাতে সেই অবস্থা অথবা তদপেক্ষা নির্ম্মলতর অবস্থা আনিয়া দেয়,তাহাই প্রায়শ্চিত্ত। সুতরাং অকৃত্রিম অনুতাপ ব্যতীত আর কিছুই পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। পাপ করিয়া চিত্তে যে মলিনতা জন্মে, অনুতাপ তাহা বিদুরিত করিয়া দেয়;— মনুষ্যের মন আবার পুর্ব্বাবস্থা অথবা তদপেক্ষা নির্ম্মলতর অবস্থা লাভ করে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। যিনি কখন অনুতাপের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তিনিই জানেন ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। যদি অকৃত্রিম অনুতাপ হয়, অর্থাৎ যদি কোন প্রকার নিকৃষ্টভাব তাহার সহিত জড়িত না থাকে,—পাপপ্রকাশ নিবন্ধন জনসমাজে অপ-

নার প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির হানি হইল বলিয়া, অথবা শারীরিক বা সাংসারিক কোন প্রকার অসুবিধা বা ক্লেশ উৎপন্ন হইল বলিয়া যে মানসিক কষ্ট,—তাহা যদি না থাকে; যদি কেবল পাপের জন্যই অন্তরে সুগভীর যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তদ্দারা পাপানুষ্ঠানজনিত চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হইবে। অগ্নিতে সুবর্ণ দগ্ধ হইয়া যেমন খাটি হয়, সেইরূপ অনুতাপানলে মানবাত্মা দগ্ধ হইয়া নির্ম্মলতা লাভ করে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেন? কেননা অনুতাপ বিলুপ্ত পবিত্রতার পুনরুদ্ধার করে। *

গত পাপের জন্য কি করিবে?

এ স্থলে খৃষ্টিয়ান্ ভ্রাতৃগণ বলিবেন যে, যদি বা স্বীকার করি যে অনুতাপদ্বারা এখন তোমার মন ভাল হইল, নির্ম্মল হইল, কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল পাপ করিয়াছ, তাহার কি হইবে? যাহা কৃত হইয়াছে, তাহা তো আর অকৃত হইতে পারে না? বর্ত্তমানে যেন মন ভাল হইল, কিন্তু ভূত কালে যাহা করিয়াছ, তাহার উপায় কি? অনুতাপদ্বারা বর্ত্তমান পাপ যেন চলিয়া গেল, কিন্তু গত পাপের জন্য কি করিবে?

গত পাপের জন্য কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা বাস্তবিক গত হইয়াছে, যাহা এখন নাই, তাহার জন্য কোন চিন্তার প্রয়োজন নাই। পাপ কোন বাহ্যপদার্থ নহে। বহি-

---

* ইংরাজী ভাষাতেও Atonement (প্রায়শ্চিত্ত) শব্দের বাক্যার্থে At-one-ment একীভূত হওয়া অর্থাৎ পাপ করিয়া পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে দূরে পড়িয়াছিলাম, বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম, আবার মিলিত হইলাম। প্রায়শ্চিত্ত সেই দূরত্ব বিনাশ করিল, একীভূত করিল, মিলিত করিল।

র্জগতের কোন ঘটনা নহে; পাপ, আত্মার অবস্থা। সুতরাং পাপ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। যে পাপ বর্ত্তমান নহে, অতীত, গত, তাহার অস্তিত্ব নাই। সুতরাং তাহার জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই, অনুতাপের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা পাপকে কোন বাহ্যপদার্থ বা বহির্জ্জগতের কোন ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই গত পাপের জন্য উদ্বিগ্ন হন। পাপ যদি যথার্থই গত হইয়া থাকে, চিত্ত যদি সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে পাপের জন্য ভাবিবার প্রয়োজন কি?

প্রকৃতিরাজ্যে ক্ষমার দৃষ্টান্ত।

আরও কয়েকটি আপত্তির মীমাংসা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, প্রকৃতিরাজ্যে একটিও ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার?" ক্ষমার দৃষ্টান্ত শত শত। নিয়ম লঙ্ঘনের ফলস্বরূপ আমার হস্তে ক্ষত হইয়াছিল; এখন ভাল হইয়া গিয়াছে। এই ভাল হওয়াই ক্ষমা। শরীরে ক্ষত হইল; আবার ভাল হইয়া গেল; ইহাতে পরমেশ্বরের ন্যায় ও ক্ষমা উভয়ই বর্ত্তমান। তাঁহার নিয়মলঙ্ঘনের ফল, ক্ষতের যন্ত্রণা; তাঁহার ক্ষমা ও দয়ার ফল, ক্ষত ভাল হওয়া। সংসারে মনুষ্য নানাপ্রকার রোগে কষ্ট পাইতেছে; উহা মনুষ্যের কর্ম্মফল। কিন্তু একদিকে যেমন রোগ; অপর দিকে তেমনি ঔষধ। তাঁহার কৃপা অসংখ্যবিধ ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছে। রোগ তাঁহার ন্যায়দণ্ড প্রদর্শন করিতেছে; ঔষধ তাঁহার ক্ষমা ও দয়া প্রকাশ করিতেছে।

অনুতাপ কি চিরস্থায়ী হয়?

দ্বিতীয়তঃ কেহ কেহ বলেন যে, পাপ স্মরণ করিলেই হৃদয় অনুতপ্ত হয়। অনুতপ্ত পাপী যখনই পাপ স্মরণ করে, তখনই তাহার

অনুতাপানল প্রজ্বলিত হয়। মন যত ভাল হয়, অনুষ্ঠিত পাপ স্মরণে অনুতাপের তীব্রতা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। তবে কি অনুতাপ অনন্তকাল স্থায়ী? যখনই পাপ স্মরণ করিব, তখনই অনুতাপ আসিবে। অনন্তকাল পর্য্যন্ত আত্মা যতই ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর হইতে থাকিবে, ততই অনুতাপের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবে। পাপের যন্ত্রণা তবে কি অনন্তকালস্থায়ী? অনন্ত নরকের মত কি সত্য?

পূর্ব্ব পাপ স্মরণে যেমন কষ্ট হয়, সেইরূপ আনন্দও হয়। একসময়ে আমি বিশেষ কোন দুষ্কার্য্য করিয়াছিলাম, মনে করিয়া যেমন কষ্ট হইল, সেইরূপ এখন আর আমি সেই দুষ্কার্য্য করি না, আমি ভাল হইয়াছি, আমি আরোগ্য-লাভ করিয়াছি, আমার বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে, ইহা মনে করিয়া হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়। আনন্দ, কষ্টকে বিনাশ করে।

এই যে ক্লেশ ও আনন্দ এই উভয়ের মধ্যে ক্লেশের কারণ ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইতে থাকে। যত দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, জীবন যায়, যুগ যুগান্তর অতিবাহিত হয়, ততই ক্লেশের কারণ "দূরাৎসুদূরে" চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু আনন্দ ক্রমশঃই বর্দ্ধনশীল থাকে। আনন্দ ক্রমশই উন্নত, বর্দ্ধিত ও ঘনীভূত হইতে থাকে। আনন্দের অতলস্পর্শ সাগরে আত্মা ডুবিয়া যাইতে থাকে। কোথা দুঃখ! কোথায় ক্লেশ! যে আত্মা আনন্দ সাগরের কূলকিনারা পায় না, তল পায় না, তাহাকে কি কোন প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা স্পর্শ করিতে পারে? জ্ঞানের উন্নতি, পবিত্রতার উন্নতি, প্রেমের উন্নতি, [illegible]নন্দের

উন্নতি, সমগ্র, সমগ্রসীভূত অনন্ত উন্নতির প্রবাহে আত্মা ভাসিয়া যায়, ডুবিয়া যায়। পার্থিব দুঃখময় স্মৃতি আর কি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে?

আর একটি কথা। শরীরে ক্ষত বা স্ফোটক হইলে বেদনা হয়। যতক্ষণ ক্ষত বা স্ফোটক থাকে, ততক্ষণ বেদনা। কিন্তু যখন উহা ভাল হইয়া যায়, তখন কি আর বেদনা থাকে? যতক্ষণ রোগ, ততক্ষণ রোগ যন্ত্রণা, আরোগ্য লাভ করিলে আর কি রোগ যন্ত্রণা থাকে? যতক্ষণ পাপ থাকে, ততক্ষণই পাপ যন্ত্রণা। পাপ চলিয়া গেলে, হৃদয় নিষ্পাপ হইলে, শুদ্ধ হইলে, পাপযন্ত্রণা থাকিবে কেন? পাঁচবৎসর পূর্ব্বে যে বিপদ্ ঘটিয়াছিল, যাহা এখন নাই, তাহার জন্য কি, কেহ এখন ভয়ে কাঁপিতে থাকে?

অনুতাপ ব্যতীত, কেবল প্রতিজ্ঞাবলে কি চিত্তশুদ্ধি হয় না?

তৃতীয়তঃ কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন অনুতাপ না হইলেই কি হয় না? কেবল প্রতিজ্ঞাবলে মানুষ কি ভাল হইতে পারে না? প্রতিজ্ঞার বল, কে না স্বীকার করিবে? প্রতিজ্ঞাবলে মনুষ্য আশ্চর্য্য ক্রিয়াসকল সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে পাপী অনুতপ্ত না হইয়া কেবল প্রতিজ্ঞাবলে চিত্তশুদ্ধি সাধন করিতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। একজনের শরীরে ময়লা লাগিল, তাহার তাহাতে কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সকলেরই কি কষ্ট হয়? মলিনতার সংশ্রবে থাকা যাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, মলিনতায় তাহার আর কষ্ট হয় না; সুতরাং মলিনতা পরিহার করিবার জন্য, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন

হইবার জন্য তাহার তাদৃশ চেষ্টা হয় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, যাহার অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছে, মলিনতার সংশ্রব তিনি সহ্য করিতে পারেন না। কোন প্রকারে তাঁহার শরীরে যদি ময়লা লাগে, তিনি তাহা ধৌত করিয়া ফেলিতে,—সম্পূর্ণরূপে পুনর্ব্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে, একান্তচিত্তে চেষ্টা করেন। ময়লাকে যিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন, শরীরে ময়লা লাগিলে তাঁহার কষ্ট হয়, এবং সেই ময়লা দূর করিবার জন্য, পরিষ্কার হইবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করেন। যাহার ময়লার প্রতি ঘৃণা নাই, শরীরে ময়লা লাগিলে তাহার কষ্ট হয় না, সুতরাং পরিষ্কার হইবার জন্য চেষ্টাও হয় না।

পাপ ও অনুতাপের সম্বন্ধ কতক পরিমাণে এই প্রকার। পাপের প্রতি যাঁহার ঘৃণা জন্মিয়াছে, পাপের সংশ্রবে আসিলে তাঁহার কষ্ট হয়, সুতরাং পাপ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন; যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পাপকে তাড়াইয়া দিতে পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি দৃঢ়ব্রত হইয়া চেষ্টা করিবেনই করিবেন। কিন্তু পাপকে যে ঘৃণা করে না, পাপের সংশ্রবে তাহার কষ্টও হয় না, এবং পাপ পরিত্যাগ করিবার জন্যও তাহার হৃদয়ে প্রতিজ্ঞার উদয় হয় না। যে বিষয়ে আমি যত কষ্ট বোধ করি, তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য সেই পরিমাণে আমার প্রতিজ্ঞার উদয় হইবে। পাপের জন্য যাহার অনুতাপ, আত্মগ্লানি, কোন প্রকার ক্লেশ নাই, পাপ পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার প্রতিজ্ঞা আসিবে কেন?

পাপের জন্য মনুষ্য যে পরিমাণে অনুতপ্ত হয়, পাপ পরিত্যাগ করিবার জন্য, সেই পরিমাণে তাহার প্রতিজ্ঞার বল হয়।

সুতরাং মনুষ্য অনুতাপ বিহীন হইয়া কেবল প্রতিজ্ঞাবলে চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। অনুতপ্ত পাপী, যন্ত্রণাগ্রস্ত রোগীর ন্যায় আরোগ্য অন্বেষণ করে। বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় শান্তি লাভের জন্য অস্থির হইয়া ভ্রমণ করে। যাঁহারা বলেন, অনুতাপ না করিয়া কেবল প্রতিজ্ঞাবলে মানুষ সম্পূর্ণ ভাল হইতে পারে, তাঁহাদের কথায় অসারত্ব স্পষ্টই বুঝা যায়। "স্ত্রীলোকের ন্যায়, বালকের ন্যায় কাঁদিয়া কি হইবে? অনুতাপ দুর্ব্বলতামাত্র। এ সকল কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মানবপ্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব কিছুই বুঝেন না। মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহারা অনভিজ্ঞ।

প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে কেমন সুন্দর কথা রহিয়াছে। মহর্ষি বলিতেছেন ;—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূযতে তু সঃ॥

মনুঃ।

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমত কর্ম্ম আর করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

অনুতাপ ভিন্ন সাধুসঙ্গ প্রভৃতি উপায়ে পাপ দূর হয় কিনা?

চতুর্থতঃ কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, অনুতাপে পাপ দূর হয়, আর কিছুতেই কি হয় না? সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি উপায়ে কি পাপ বিনাশ হয় না? কেন হইবে না? যাহা কিছু আত্মোন্নতির প্রকৃত উপায়, তাহাতেই পাপ বিনাশ করে। তবে কেন বিশেষ করিয়া বলা হইল, অনুতাপই

পাপের প্রায়শ্চিত্ত? এই বিশেষ করিয়া বলিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পাপীর হৃদয়ে অনুতাপের সঞ্চার হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রকার উপায়েই তাহার কিছু হয় না। যাহার হৃদয় এমনি অসাড় হইয়া গিয়াছে যে, পাপ করিয়াছি বলিয়া ক্লেশ হয় না; সে সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, যাহাই কেন করুক না, তাহাতে তাহার কি হইবে? পাপের প্রতি যাহার ঘৃণার উদয় হয় না, পুণ্যের প্রতি তাহার প্রকৃত শ্রদ্ধার উদয় হওয়া সম্ভব নহে। পাপ কি, যে প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারে না, পুণ্য কি, তাহা সে কেমন করিয়া অনুভব করিবে? পাপ পুণ্যের জ্ঞান আপেক্ষিক। আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্রেই একই জ্ঞান। পাপকে যে জানে না, পুণ্যকেও সে জানে না। জ্ঞান সম্বন্ধে যেমন, ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। পাপকে যে ঘৃণা করিতে পারে না, পুণ্যকেও সে শ্রদ্ধা করিতে পারে না। পাপের প্রতি ঘৃণা হইলেই পাপের জন্য কষ্ট হইবে; কষ্ট হইলেই পাপ ত্যাগের জন্য প্রতিজ্ঞা আসিবে। যে পরিমাণে কষ্ট, সেই পরিমাণে প্রতিজ্ঞার বল।

তবে কি যত দিন অনুতাপ না হয়, ততদিন সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি পাপীর পক্ষে সকলই বৃথা? কখনই না। ঐ সকল উপায়ে পাপীর হৃদয়ে পাপের প্রতি ঘৃণা এবং পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে, সুতরাং অনুতাপ আনিয়া দেয়। সাধুসঙ্গ প্রভৃতিদ্বারা পাপী অনুতাপ শিক্ষা করে। সাধুসঙ্গ প্রভৃতি উপায়দ্বারা যত পাপের প্রতি তাহার ঘৃণা বৃদ্ধি হয়, অনুতাপের তীব্রতা, সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, সুতরাং একভাবে দেখিতে গেলে যাহা কিছু আমা-

দের মনকে ভাল করিয়া দেয়, পাপের প্রতি ঘৃণা ও পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে, তাহাতেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কেবল সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ ও শাস্ত্রপাঠ কেন? প্রার্থনা, আরাধনা, নামকীর্ত্তন, সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু অনুতাপই মূল। অনুতাপের পবিত্র অনলে দগ্ধ না হইলে মন খাটি হয় না। পরমেশ্বরের কৃপায় সেই অগ্নি যখন অন্তরে জ্বলে, তখনই আমাদের পাপ জঞ্জাল দগ্ধ হইতে থাকে;—তখনই পাপী সরল ভাবে প্রার্থনা করিতে সক্ষম হয়। নতুবা অসাড় আত্মার প্রার্থনা শূন্যে উত্থিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। অনুতাপানলে জ্বলন্ত হৃদয়ের জ্বলন্ত প্রার্থনা, পাপীর হৃদয়ের পাপতাপ চিরদিনের জন্য ভস্মীভূত করিয়া দেয়।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করিলাম, এখন সংক্ষেপে তাহার পুনরালোচনা করি। ১ম, পাপ হইতে কেমন করিয়া উদ্ধার হইব, ইহা সকল দেশের, সকল যুগের, সকল সম্প্রদায়ের মুমুক্ষুগণের আন্তরিক প্রশ্ন। ইহা ধর্ম্মজগতের সার্ব্বভৌমিক জিজ্ঞাসা। ২য়, পাপ বিষয়ে লোকের যেমন জ্ঞান ও বিশ্বাস, প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস তদনুরূপ হইয়া থাকে। যে মনে করে, পাপ কোন বাহ্যিক বা শারীরিক পদার্থ, তাহার প্রায়শ্চিত্তও বাহ্যিক ও শারীরিক। ৩য়, পাপ অন্তরে; সুতরাং প্রায়শ্চিত্তও অন্তরে হওয়া চাই। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ৪র্থ, অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এই মতের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, সকলই নিতান্ত অসার ও অযুক্ত। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিলে পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়; অনুতাপ পাপের

প্রায়শ্চিত্ত হইলে পাপের দণ্ড থাকে না, এই সকল কথা যাঁহারা বলেন, অনুতাপ কাহাকে বলে, অনুতাপ যে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ, তাহা তাঁহারা জানেন না। ৫ম, পরমেশ্বরের অনন্ত ন্যায় ও অনন্ত দয়া পরস্পর বিরোধী নহে। পাপীকে তিনি যে দণ্ডবিধান করেন, তাহাতে ন্যায় ও দয়া একত্রে সমঞ্জসীভূত-রূপে কার্য্য করে। ৬ষ্ঠ, পরমেশ্বর যদি ন্যায্যদণ্ড হইতে পাপীকে অব্যাহতি দেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষমা প্রকাশ পায় না। তাঁহার প্রদত্ত শাস্তিই তাঁহার ক্ষমা। পাপীর প্রতি তিনি যে দণ্ডবিধান করেন, তাহাতেই তাঁহার ক্ষমা প্রকাশ পায়। তাঁহার অনন্ত ক্ষমা। ৭ম, প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক মতে পরমেশ্বরের ন্যায় ও দয়ার সামঞ্জস্য হয় না। উহাতে পরমেশ্বরের ন্যায় ও দয়ার কোনটিই রক্ষা পায় না। ৮ম, অকৃত্রিম অনুতাপ হৃদয়ের পাপকালিমা বিদূরিত করিয়া দেয়, চিত্তের নির্ম্মলতার পুনরুদ্ধার করে, সেই জন্যই অনুতাপকেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলা হয়। ৯ম, পাপ, আত্মার একটি অবস্থা; উহা কোন বাহ্যপদার্থ নহে, অথবা বাহ্যজগতের কোন ঘটনা নহে। পাপ, আত্মার একটি অবস্থা; সুতরাং পাপ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। গত পাপের অস্তিত্ব নাই; সুতরাং তাহার জন্য অনুতাপ করিবার প্রয়োজন নাই। ১০ম, প্রকৃতিরাজ্যে দণ্ড ও ক্ষমা উভয়ই দেখিতে পাই। নিয়মলঙ্ঘনে রোগ, পরমেশ্বরের শাস্তি, আরোগ্যে তাঁহার ক্ষমা ও কৃপা। রোগ সকল তাঁহার ন্যায়দণ্ড প্রদর্শন করিতেছে; বিবিধ প্রকার রোগের ঔষধ তাঁহার মাতৃস্নেহ প্রকাশ করিতেছে। ১১শ, অনুতাপ কখন চিরস্থায়ী হইতে পারে না। অনন্ত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা

নিশ্চয়ই বিলোপদশা প্রাপ্ত হইবে। ১২শ, অনুতপ্ত না হইয়া কেবল প্রতিজ্ঞাবলে পাপাসক্ত ব্যক্তি কখন চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ১৩শ, সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি উপায়ে চিত্তের নির্ম্মলতা লাভ করা যায়, উহাতে পাপাসক্ত হৃদয়ে অনুতাপ ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং পাপীকে অনন্ত উন্নতি পথে অগ্রসর করিয়া দেয়।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? মুমুক্ষু হৃদয়ের এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তরে শতকণ্ঠে বলি, অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অনুতাপের অশ্রু মনুষ্যের হৃদগত গভীর কালিমা যেমন বিধৌত করিয়া দিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। এই হাসি কান্নাময় জগতে দুর্ব্বল মনুষ্যকে অনেক সময় কাঁদিতে হয়। আমরা অনেক সময় কাঁদিয়া যাহা পাই, অন্য কোন প্রকারে তাহা পাই না। একবিন্দু অনুতাপের অশ্রুর নিকটে কোটী কোহিনুর হার মানে। কোহিনুরের মূল্য আছে; অনুতাপাশ্রু অমূল্য। কাঁদিয়া কাঁদিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, সেই অনন্ত পুরুষের অনন্ত নিকেতনে চল। তাঁহার শ্রীচরণতলে বসিয়া পরমার্থ, সর্ব্বার্থ, সর্ব্বসিদ্ধি লাভ কর। মোহকোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, দুঃখদুর্গতি পাপপ্রলোভনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃতার্থ হও। সুনির্ম্মলা শান্তি ও দেবদুর্লভ ভক্তিরসের আস্বাদ পাইয়া আপ্তকাম হও।

সম্পূর্ণ।